দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

বিজেপি ক্ষমতায় এলে হিংসা ছড়াবে তৃণমূল

— পৃঃ ২৩

মতুয়ারা গভীর রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার

— পৃঃ ১১

৭৩ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা।। ১ মার্চ ২০২১।। ১৬ ফাল্গুন - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

রাজ্যে ক্ষমতা বদল হলেও নতুন শাসককে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ২৭ সংখ্যা, ১৬ ফাল্গুন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১ মার্চ - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২২,
Website : www.eswastika.com

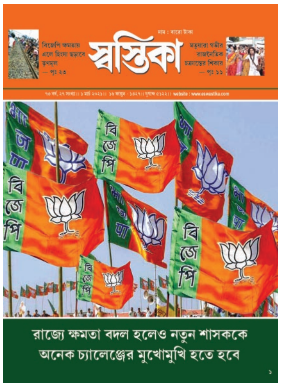
দাম : বারো টাকা
বিজেপি ক্ষমতায় এলে হিংসা ছড়াবে তৃণমূল — পৃঃ ২৩
স্বস্তিকা
মতুয়ারা গভীর রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার — পৃঃ ১১
রাজ্যে ক্ষমতা বদল হলেও নতুন শাসককে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত
সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪
অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
দাম : ১২ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫
কমিউনিস্ট ‘শ্রেণী-চেতনা’র বহিঃপ্রকাশে টুম্পা গান : রাজ্য রাজনীতির নতুন অঙ্গ □ বিশ্বামিত্র □ ৬
সুন্দর মৌলিকের চিঠি : টেট ভেট বাতিল □ ৭
করোনা মোকাবিলায় ভারতের ভূমিকা পাশ্চাত্য দেশগুলির তুলনায় বেশি ফলদায়ী □ ডা: দেবী শেঠী □ ৮
মতুয়ারা গভীর রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার □ কে. এন. মণ্ডল □ ১১
ভারতের রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তাব □ দেবাশিস মুখোপাধ্যায় □ ১৩
বঙ্গ রাজনীতিতে কদর্য ভাষার রমরমা □ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ১৬
সংগঠককে ক্যারিশ্মা সম্পর্কে সচেতন এবং ব্যক্তিপূজা থেকে দূরে থাকতে হবে □ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ১৭
বিজেপি ক্ষমতায় এলে তৃণমূল হিংসা ছড়াবে □ সুকল্প চৌধুরী □ ২৩
পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন পরবর্তী সরকারের এক বৃহৎ চ্যালেঞ্জ □ ড. রতন কুমার ঘোষাল □ ২৬
সভ্যতার বিকাশে ভারতের অবদান □ বীরেন্দ্রনাথ শুকুল □ ৩১
লোক সংস্কৃতি ও ইতিহাসের মেলবন্ধনে পুদিচ্চেরীর মানাকুল্লা বিনয়গড় মন্দির □ কৌশিক রায় □ ৩৩
বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসকে বাঙ্গালি চিরকাল মনে রাখবে □ কল্যাণ চৌবে □ ৩৬
প্যারাটিচারদের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ কেন? □ বরুণ মণ্ডল □ ৩৭
‘চলো পাল্টাই’ এই চ্যালেঞ্জ নিয়েই বিজেপি সোনার বাঙ্গলা গড়বে □ দিলীপ ঘোষ □ ৪৩
স্বামীজীর মানসকন্যা ক্রিস্টিনও ভারতকল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন □ স্বপ্না কুণ্ডু □ ৬৪
প্রবহমান হিন্দুধর্মের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক শ্রীচৈতন্যদেব □ গৌতম কুমার মণ্ডল □ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ □ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** □ **সুস্বাস্থ্য : ২১** □ **অঙ্গনা: ২২** □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩০,৩৫** □ **খেলা : ৩৮** □ **রঙ্গম : ৩৯** □ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** □ **চিত্রকথা : ৪২** □ **শব্দরূপ : ৫০**

প্রকাশিত হবে
৮ মার্চ
২০২১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৮ মার্চ
২০২১

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

পশ্চিমবঙ্গ কোন পথে

সত্তরের দশকের গোড়ায় দেশের সর্বমোট জিডিপি-র মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অবদান ছিল তিরিশ শতাংশ। ২০১১ সালে বামফ্রন্টের বিদায়লগ্নে সেটি দাঁড়িয়েছিল তিন শতাংশে। তৃণমূল আমলে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আরও খারাপ। দেশের জিডিপিতে পশ্চিমবঙ্গের অবদান দেড় শতাংশেরও কম। এখন পশ্চিমবঙ্গের ঋণের পরিমাণ প্রায় ৫ লক্ষ কোটি টাকা। বামফ্রন্ট আমলে ছিল ৩ লক্ষ ৯৬ হাজার কোটি টাকা। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়— পশ্চিমবঙ্গ কোন পথে?

লিখবেন তথাগত রায়, রন্তিদেব সেনগুপ্ত, সুজিত রায়, জিষ্ণু বসু প্রমুখ।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

সানরাইজ ®

শাহী গরম মশলা

AUTHENTIC INDIAN SPICES
SUNRISE
Shahi
Garam Masala

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গের আজ প্রয়োজন সুশাসন

এই কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, দেশবিভাজনের দুঃসহ যন্ত্রণা বঙ্গবাসীর মতো আর কেহ ভোগ করে নাই। স্বাধীনতার পূর্ব হইতেই উভয় বঙ্গেই বাঙ্গালির উপর নামিয়া আসিয়াছিল পৈশাচিক অত্যাচার। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দূরদর্শিতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে অস্তিত্ব রক্ষার ভূমিটুকু পাইয়া তাহারা ভাবিয়াছিল দুঃখের দিন বোধ হয় শেষ হইল। একদিন গ্রামবাঙ্গলার ঘরে ঘরে গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গোরু আর পুকুর ভরা মাছ ছিল। প্রকৃত অর্থেই বঙ্গপ্রদেশ ছিল সোনার বাঙ্গলা। কিন্তু স্বাধীনতার পরও তাহাদের যন্ত্রণা ঘুচিল না। সোনার বাঙ্গলা একবারে ছারখার হইয়া গিয়াছে। সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সর্বক্ষেত্রেই অধঃপতন নামিয়া আসিয়াছে বহু পূর্বেই। দীর্ঘ চার দশকের অধিক সময় ধরিয়া ইহা অধিকতর প্রকট রূপ ধারণ করিয়াছে। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস হইয়াছে, স্বাস্থ্য পরিষেবা তলানিতে। চিকিৎসার জন্য অন্য রাজ্যের মুখাপেক্ষী থাকিতে হয়। দুইমুষ্টি অন্নের জন্য গ্রামের গরিব যুবকদের ভিন রাজ্যে পাড়ি দিতে হইতেছে। শিল্পক্ষেত্রের সলিল সমাধি ঘটিয়াছে। সবচাইতে বড়ো কথা, সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা অন্তর্হিত হইয়াছে। এককথায় বলিতে হইলে পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটি শেষের দিক হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ না থাকা সত্ত্বেও পাঁচ বৎসর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবাসী ভয়, অপমান, লাঞ্ছনা, হতাশা ও কষ্ট লাঘবের আশায় নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের অবস্থার পরিবর্তন আর হয় না। আজ দেশের বাহিরে অথবা দেশের অন্য রাজ্যে বঙ্গবাসী নিজেদের বাঙ্গালি বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিতেছে। মাত্র দুই দশক আগে বিহারবাসী এইরূপ লজ্জা অনুভব করিতেন। সমগ্র বিহার রাজ্যে জঙ্গলের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল তৎকালীন রাজ্য সরকার। একদা যে মগধ তথা অধুনা বিহার রাজ্য ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র ছিল, তাহারাও অদ্যকার বঙ্গবাসীর মতো সর্বত্র ধিক্কৃত হইতেন। সেই বিহারবাসী তাহাদের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অধিক সময় অপমান সহ্য করিতে করিতে বঙ্গবাসীর পিঠ দেওয়ালে ঠেকিয়া গিয়াছে। মনে হইতেছে, এইবার তাহাদের কলঙ্কমোচনের সময় আসিয়াছে।

স্বভাবতই একটি প্রশ্ন উঠিতেছে, বিগত চল্লিশ বৎসরাধিক সময়ের অন্তঃসারশূন্য পশ্চিমবঙ্গের হৃতগৌরব কীভাবে পুনরুদ্ধার হইবে? রাজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্র কায়েমি স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকরা ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সমাজবিদরা মনে করিতেছেন, নির্বাচনের পর নবাগত শাসককে এক বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হইতে হইবে। কেননা, দীর্ঘ সময় ধরিয়া রাজ্যের সর্বস্তরে যে অবক্ষয় ঘটিয়াছে তাহা সামাল দেওয়া খুব কঠিন কাজ হইবে। তাহার উপর সর্বত্র যে দুর্বৃত্তায়ন ঘটিয়াছে, সেই রাজনীতি আশ্রিত দুর্বৃত্তরাও হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিবে না। সর্বক্ষেত্রে তাহারা অরাজকতা সৃষ্টি করিয়া নবাগত সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু সুশাসনের স্বার্থে নবাগত সরকারকে নিরপেক্ষ ভাবে তাহা কঠোর হস্তে দমন করিতে হইবে। পরিবর্তনকামী রাজ্যবাসীকেও ইহার জন্য সরকারের পার্শ্বে থাকিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকদের লক্ষ্য থাকে শুধুমাত্র আগামী নির্বাচনে জয়লাভ করা। যেনতেন প্রকারে নির্বাচনে জয়লাভ করিতে পারিলেই তাহাদের পোয়াবারো। কিন্তু প্রকৃত রাষ্ট্রনায়কের লক্ষ্য শুধুমাত্র আগামী নির্বাচনই নয়, লক্ষ্য থাকে আগামী প্রজন্মের প্রতি। কীভাবে আগামী প্রজন্ম সর্বদিক হইতে বিকশিত হইবে, তাহার জন্য তাঁহার বিশেষ পরিকল্পনা থাকে। বঙ্গবাসীকে বুঝিতে হইবে, সরকার আসে আবার চলিয়াও যায়। কিন্তু জনগণ প্রজন্মের পর প্রজন্ম এইখানেই বসবাস করিবে। দেশ আজ যথার্থ রাষ্ট্রনায়কের সুশাসনের ফলভোগ করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ ইহাতে কেন বঞ্চিত থাকিবে? আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বঙ্গবাসীকে দেশভক্ত শাসককে সরকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজেদের কষ্ট, বঞ্চনা ও অপমানের সমাপ্ত করিয়া রাজ্যের হৃতগৌরব ফিরাইয়া আনিতেই হইবে।

সুভাষিতম্

উত্তমো নাতিবক্তা স্যাৎ অধমো বহু ভাষতে।
ন কাঞ্চেন ধ্বনিস্তাদৃক্ যাদৃক্ কাংস্যে প্রজায়তে।।

উত্তম ব্যক্তিরা বেশি কথা বলেন না। অধম ব্যক্তিরা বেশি কথা বলে। যেমন কাঁসার যত শব্দ হয়, সোনার তত হয় না।

কমিউনিস্ট ‘শ্রেণী-চেতনা’র বহিঃপ্রকাশে টুম্পা গান : রাজ্য-রাজনীতির নতুন রঙ্গ

বিশ্বামিত্র

সিপিএমের ‘টুম্পা’ গানের প্যারডি এই মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়ায় সবচেয়ে আলোচিত। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় সেটি শেয়ার করার পর তা পার্টি কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে তো বটেই, সাধারণ লোকের মধ্যেও ভাইরাল হয়ে গেছে। টুম্পা একটি চটুল গান। পরকীয়ার উপর গানটির ভিত্তি-নির্ভর করে আছে। কিন্তু পরকীয়া ছাপিয়ে সেখানে ‘মজা’টাই প্রাধান্য পেয়েছে। গানটি যারা জানেন না বা শোনেননি তাদের জন্য বলি সাম্প্রতিক একটি ওয়েব সিরিজ প্রকাশিত হয়েছে, ‘রেস্ট ইন প্রেম’; ফেসবুকে কেউ মারা গেলে সংক্ষেপে লেখা হয় আরআইপি বা রিপ অর্থাৎ রেস্ট ইন পিস, এখানেও ফেসবুকীয় শোক-জ্ঞাপনের অনুকরণে লেখা হয়েছে আরআইপি অর্থাৎ রেস্ট ইন প্রেম। এই ধরনের ছবি কেমন হবে বোঝাই যায়, রুচি-বিকৃতির প্রসঙ্গ আমরা তুলছি না। সবার রুচি এক নয়। প্রত্যেকের নিজস্ব রুচিবোধকে সম্মান করা কর্তব্য বলেই মনে হয়। কিন্তু ২৮ তারিখ ব্রিগেড-সমাবেশের জন্য লোক ডাকতে কমরেডদের এই সস্তা উপায়ের আশ্রয় নিতে হবে, সেটা দুর্ভাগ্যজনক। কেন দুর্ভাগ্যজনক? সেটা দেখা যাক।

এই প্রশ্নে আসার আগে জানানো কর্তব্য, কোনও নীতি-পুলিশগিরি এখানে করা হচ্ছে না। কিন্তু রাজনীতিতে ‘আনপার্লামেন্টারি’ বা অসাংবিধানিক বলে একটা শব্দ প্রচলিত আছে। মানে যে শব্দ আমরা সাধারণভাবে ব্যবহার করি, সে রাগের মাথায় বা কোনও কারণে ধৈর্যচ্যুতি ঘটলেই হোক বা মুখ দিয়ে গালিগালাজ বের হলে, তাকে ‘আনপার্লামেন্টারি’ ল্যাঙ্গুয়েজ বলে। তার মানে শুধু এই নয় যে এই ভাষা সংসদে অচল, সাধারণভাবে প্রকাশ্যেও তা বলা যায় না, অন্তত রাজনৈতিক মঞ্চে তো নয়ই। কিন্তু বর্তমানে রাজনীতির যে মান অবনমন ঘটেছে, তাতে এজিনিস অপ্রত্যাশিত নয়।

এই কারণে জনপ্রিয় নায়ক তথা সাংসদ দেবের সিনেমায় অভিনীত চটুল গানে কোনও জনপ্রতিনিধি যখন নাচেন, কিংবা কোনও রাজনৈতিক দল যখন তাদের ১৫ আগস্টের সমাবেশে এই গানের সঙ্গে নাচেরও আয়োজন করে তখন তাদের সমালোচনার মুখে পড়তে হয়, দেব সেই দলের সাংসদ হলেও। আশ্চর্যের কথা, যে মাওবাদীরা তৃণমূলের আশ্রয়ে আছে, তারাও এই প্যারোডিকে সোচ্চারে সমর্থন তো করেছে, কারণ ‘ছোটোলোকে’র মুখের ভাষার এই গান নাকি গান জিনিসটা যে ‘ভদ্রলোকে’দের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, তা প্রমাণ করছে। এবার আমাদের মূল বক্তব্যে আসি। উদ্ধৃতি-চিহ্নের মধ্যে এই ছোটোলোক ও ভদ্রলোক শব্দদুটির আবিষ্কারক কিন্তু আমরা নই, বামপন্থীরা। স্বাধীনতার পর পার্টির জন্মলগ্ন থেকে গরিব, খেটে খাওয়া, কৃষিজীবী, শ্রমজীবী মানুষকে অবলুপ্ত সামন্তপ্রথার জুজু দেখিয়ে, কখনও বা ব্রাহ্মণ্যবাদের কল্পিত তথ্য খাড়া করে পার্টির নেতারা, যারা অধিকাংশই ছিলেন তথাকথিত উচ্চবর্ণের, তারাই এঁদের নিজেদের তাঁবে রাখতে চেষ্টা করেছেন। আর এর সূত্র ধরেই ‘ভদ্রলোক’- ‘ছোটোলোক’ তত্ত্বের উদ্ভাবন করে কমিউনিস্টরা। নিজেদের ‘ছোটোলোক’ শ্রেণীর প্রতিনিধি প্রতিপন্ন করে যারাই বিরোধী, তাদের উচ্চশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে দাগিয়ে দিয়ে বিরোধী-শূন্য রাজনীতির চেষ্টা কমিউনিস্টরাও করেছিল। ১৯৭০-এ সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের মতো জঘন্য, নৃশংস ঘটনাকে এই তত্ত্ব দিয়েই এখনও আড়াল করার চেষ্টা হয়।

আসলে আন্তর্জাতিক স্তরে কমিউজিমের যে থিয়োরি আছে সেখানে বিত্ত, ক্ষমতা দিয়েই সব কিছু স্থির হয়, কমিউনিস্টদের ভাষায় শ্রেণী-চেতনা। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিতে কমিউনিস্ট-কালচার একবারেই বেমানান। ব্রাহ্মণরা এখানে সর্বোচ্চ সম্মান পান, কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী ক্ষত্রিয়রা। আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি চারিবর্ণ অতীতে বংশানুক্রমিক ছিল না, কার্য অনুসারে তা হতো। স্বয়ং কার্লমার্কসই যেখানে ভারতীয় সংস্কৃতিকে বুঝতে চাননি, সেখানে তো তাঁর ভক্তরা বুঝতে চাইবেই না। চাইলে আর যাই হোক, কায়েমি ক্ষমতা তো দখল করা যাবে না। কয়েক প্রজন্মের সর্বনাশ করার পরে কমিউনিজমের আসল রূপটি বর্তমান প্রজন্মের সামনে পরিস্ফুট, পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছর ক্ষমতা ভোগ করার পর কমিউনিস্ট-শাসকের বর্বর রূপ এখন ভারতের মানুষ দেখেছেন। কমিউনিজমের সঙ্গে সঙ্গে তাদের এইসব বস্তাপচা তত্ত্বেরও অবসান হয়েছে। এখন নতুন বোতলে পুরনো মদ ভরার মতো টুম্পা-গানের মধ্যে দিয়ে সিপিএম তাদের চিরাচরিত কমিউনিস্ট-তত্ত্বকেই আবার সামনে আনতে চাইছে। এনিয়ে কিছু বলার থাকতে পারে না। কারণ সব মানুষকে কিছুদিন বোকা বানিয়ে রাখা যায়, কিন্তু চিরদিন বোকা বানানো যায় না। কিন্তু দুঃখ লাগে, যারা মুখে বড়ো বড়ো সংস্কৃতির কথা বলে, বঙ্গ- সংস্কৃতির ঠিকা যারা নিয়ে একদা ঘোষণা করেছিল ‘আরএসএস-বিজেপি বঙ্গ- সংস্কৃতির সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না’, একসময় সলিল- হেমন্তকে দিয়ে যারা নিজেদের ব্র্যান্ডিং করতো তাদের মুখোশটা একটু একটু করে খসে পড়তে দেখে আশা জাগছে, কমিউনিজমের ‘মুখ’টিও ক্রমশ প্রকাশ্যে আসবে। তৃণমূলের যে মাওবাদীকরণ সম্পন্ন হয়েছে তা বোঝা যায় ‘খেলা হবে’ গানে। বঙ্গ-সংস্কৃতি যে ক্রমশ বিপন্ন হচ্ছে, তা বোঝা যাচ্ছে। □

টেট ভেট বাতিল

মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,

দিদি, আপনাকে আজ আমি মুখ্যমন্ত্রী বলেই সম্বোধন করলাম। কারণ, যা হাওয়া দেখছি তাতে এমন সম্বোধন আর কতদিন করতে পারব বুঝতে পারছি না। সেই দুঃখ সদ্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে বড় ধাক্কা খেয়েছেন আপনি। শিক্ষক নিয়োগে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। মেধা তালিকায় গরমিল এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন চাকরি প্রার্থীরা। তার শুনানি করতে গিয়েই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ দেন বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত রাখতে হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ইতিমধ্যেই ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। কিন্তু দিদি, ভোটের আগে যে টেট নামক ভেট দিতে চেয়েছিলেন সেটা কিন্তু জলে গেল।

মনে পড়ছে দ্রুত প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে বলে গত ১১ ডিসেম্বর আপনি নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছিলেন। সেই ঘোষণার দু'মাসের মধ্যেই মেধা তালিকা প্রকাশিত হয়। তাড়াতাড়ি চাকরিপ্রাপকদের নিয়োগপত্র দেওয়া হবে বলেও পর্ষদ জানায়। সঙ্গে সঙ্গেই সেই তালিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে বিজেপি। এমনকী এই হুঁশিয়ারিও দিয়ে রেখেছে যে, যদি বিজেপি ক্ষমতায় আসে এ নিয়ে তদন্ত কমিশন গঠন হবে।

আমার মনে আছে সেদিন সোমবার ছিল। ১৫ ফেব্রুয়ারি। গভীর রাতে মেধাতালিকা প্রকাশ করে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। কেন রাত দুটোর সময় তালিকা প্রকাশ হলো কে জানে? গত ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৬ হাজার ৫০০টি শূন্য পদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। বলা হয়েছিল, যাঁরা টেট উত্তীর্ণ এবং যাঁদের প্রশিক্ষণ রয়েছে শুধু তাঁরাই আবেদন করতে পারবেন। সোমবার প্রকাশিত মেধা তালিকায় রয়েছেন ১৫ হাজার ২৮৪ জন। কিন্তু তারা অন্তত ভোটের আগে চাকরিটা পাচ্ছেন না। এই ভুলের দায় কে নেবে দিদি?

রাজ্যে প্রায় সাড়ে ১৬ হাজার শূন্যপদে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারির পরই আদালতের দ্বারস্থ হন চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। তাঁরা অভিযোগ করেন, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিস্তর গরমিল রয়েছে। রাতারাতি মেসেজ পাঠিয়ে এবং ফোন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হচ্ছে। কীসের ভিত্তিতে চাকরি দেওয়া হচ্ছে, লিখিত পরীক্ষায় কে, কত নম্বর পেয়েছেন এবং ইন্টারভিউয়ে কত পেয়েছেন, সেই সংক্রান্ত কোনও তথ্যই প্রকাশ করা হচ্ছে না। এমনকী মেধাতালিকা প্রকাশেও যথেষ্ট অস্বচ্ছতা রয়েছে বলে অভিযোগ করেন চাকরিপ্রার্থীরা। তাঁদের অভিযোগ ছিল, মেধাতালিকা প্রকাশেও নিয়ম মানা হয়নি। তাই এই নিয়োগ প্রক্রিয়া আপাতত বন্ধ রাখাই শ্রেয়।

এর আগে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে ভুরি ভুরি দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু আমার ওই প্রশ্নটা মাথা থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না যে, মধ্য রাতে কেন এই তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়া যে পরীক্ষার ভিত্তিতে এই মেধা তালিকা তাতে ৬টি ভুল প্রশ্ন ছিল। তা নিয়ে একটি মামলা হয়। এখনও যার শুনানি চলছে। মার্চ মাস নাগাদ আদালত রায় জানাতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। তার আগে ভোটের মুখে যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তার মধ্যে এমন কয়েকজনের নামও নাকি রয়েছে যাঁরা ভুল প্রশ্নের জন্য আদালতে গেছেন। এর ফলে যাঁরা আদালতে যেতে পারেননি তাঁদের প্রতি বঞ্চনা করা হচ্ছে না তো! তবে কি মামলা করতে পারাটাও চাকরি পাওয়ার অন্যতম যোগ্যতা?

এ সব প্রশ্ন এখন অতীত। নিয়োগ বন্ধ আপাতত। আমি ভাবছি একটা চাকরি মানে তার সঙ্গে ৫ গুণ করলে যা হয় ততগুলো ভোট। মানে সংখ্যাটাতো অনেক বড়। কী যে হবে দিদি! □

ডাঃ দেবী শেঠী

করোনা মোকাবিলায় ভারতের ভূমিকা পাশ্চাত্য দেশগুলির তুলনায় বেশি ফলদায়ী

আমাদের করোনা টিকা প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি যে অতি অল্প সময়ে ৫০ কোটি টিকা তৈরি করতে সক্ষম সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যেই তারা বিপুল পরিমাণ টিকা তৈরি করে বসে আছে। যদি বিক্রির বিষয়টা নিশ্চিত হয়ে যায় তাহলেই তারা বাড়তি উৎপাদনে সঙ্গে সঙ্গে হাত লাগাবে। গরিবদের টিকাকরণ সরকার নিষ্ঠার সঙ্গে চালিয়ে যাবে। অন্যদিকে দেশের জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশ যাতে উল্লেখিত অত্যন্ত কম দামে টিকার নাগাল পায় তাও সরকারের দেখবে।

করোনা মহামারীর শুরুতেই প্রলম্বিত লকডাউন জারি করতে আদৌ বিলম্ব করেনি আমাদের সদা সক্রিয় কেন্দ্রীয় সরকার। এর ফলে মহামারীর করাল দিনগুলিতে অর্থশালী পাশ্চাত্য দেশগুলির তুলনায় আমাদের দেশের কার্য সম্পাদন অনেকগুণ ইতিবাচক ও ফলদায়ী হয়েছিল। এই সূত্রে যদি আমরা করোনা মহামারীতে বিভিন্ন দেশগুলিতে কত সংখ্যায় মানুষ মারা গেল তাকে মানদণ্ড ধরি তাহলে দেশ হিসেবে আমরা প্রথম পুরস্কার পাব মৃতের কম সংখ্যার নিরিখে।

তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই এখনও শেষ হয়নি। এমন অশুভ সংকেতও পাওয়া যাচ্ছে যে একটি দ্বিতীয় ধাক্কা হয়তো দেশের ওপর আছড়ে পড়তে পারে। নতুন করোনার জীবাণুটির উৎসমূল যেখানেই হোক না কেন তা জানা না থাকলেও আমরা এটুকু নিশ্চিতভাবে বলতে পারি এই নতুন সংস্করণটি আরও বেশি ছোঁয়াচে হলেও ততটা প্রাণঘাতক নয়। অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম করোনার একটি নতুন প্রজাতি হয়তো দীর্ঘদিনের হতাশা ও অলস অবস্থা কাটিয়ে সদ্য প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠতে থাকা একটি দেশের ওপর নতুন অশনি সংকেত হয়ে আসতে পারে। এর পরিণতিতে এক বছর ধরে প্রবল পরাক্রমশালী জীবাণুর সঙ্গে লড়ে বিধ্বস্ত দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ওপর নতুন চাপ তৈরি হবে। এটা কখনই হতে দেওয়া যায় না। একে আটকাতেই হবে।

তবে সৌভাগ্যজনকভাবে আমাদের হাসপাতালগুলি ইতিমধ্যে এই জীবাণুর সঙ্গে লড়তে নিজেদের যথেষ্ট সক্ষম করে তুলেছে। আজকে সরকারের সময়োচিত হাত লাগানোর ফলে আমাদের হাতে রয়েছে বিপুল সংখ্যক পিপিই-র প্রতিষেধক বর্ম, ভেন্টিলেটর ও রোগীকে চিকিৎসা দেওয়ার পরিকাঠামো। বিগত এক বছরের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমাদের ডাক্তারবাবুরা উপলব্ধি করেছেন করোনা রোগীর ক্ষেত্রে ভেন্টিলেটার ব্যবহারের থেকে অক্সিজেন দেওয়া ও সস্তা দামের স্টেরয়েড ব্যবহার বেশি ফলদায়ী হয়।

এই অবস্থায় আমরা কিছুটা দ্বিধান্বিত মানসিকতার মধ্যে রয়েছি। পাশ্চাত্য দেশগুলির অনুসৃত করোনার মোকাবিলা কিছুটা শ্লথ গতিতে করা যেমন, টিকাকরণের বিষয়ে অনেক বাছবিচার করে এগনোই সঠিক পথ না কি আমাদের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি রয়েছে যার ফলে আমরাই বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন দেশ হিসেবে আজ নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছি তার আরও প্রমাণ রাখতে আগামী এক মাসের মধ্যে দেশের ৫০ শতাংশ নাগরিকের সফল টিকাকরণ করে ফেলব।

উন্নত দেশগুলি বিলম্বিত টিকাকরণ জনিত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের ক্ষতি সময়ের সঙ্গে পুষিয়ে নিতে পারবে যেটা আমাদের পক্ষে সঠিক নয়। পাশ্চাত্যের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিকাঠামো হাজার হাজার কোভিড রোগীকে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা প্রদান করে যেতে পারে। আমাদের পরিকাঠামো তা পারবে না, কেননা আমাদের জনসংখ্যাই পাশ্চাত্য বহু দেশের সম্মিলিত সংখ্যার চেয়ে বহুগুণ বেশি। সেই কারণেই ভাইরাসের ওপর আমরা চাই ‘সার্জিক্যাল স্ট্রাইক’। প্রশ্ন উঠবে, ৫০ কোটি লোককে টিকা দেওয়ার খরচ উঠবে কী করে? সম্বলহীন মানুষদের সরকার যেমন বিনা মূল্যে টিকা দিচ্ছে তা চালু থাকুক। সরকারি প্রচেষ্টা পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে দেশের টিকা উৎপাদকরা জন প্রতি ৩০০ টাকা দরে টিকা হসপিটালগুলিকে বিক্রি করুক, তারা টিকা দেওয়ার খরচ হিসেবে ১০০ টাকা করে নেবে। এই মোট চারশো টাকায় এটিই হবে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা কম দামে টিকাকরণ প্রকল্প। সরকারের কাজ কড়া নজর রাখা— যাতে টিকা ঠিক সময়ে হাসপাতালগুলিতে পৌঁছয়।

হ্যাঁ, আমাদের করোনা টিকা প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি যে অতি অল্প সময়ে ৫০ কোটি টিকা তৈরি করতে সক্ষম সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যেই তারা বিপুল পরিমাণ টিকা তৈরি করে বসে আছে। যদি বিক্রির বিষয়টা নিশ্চিত হয়ে যায় তাহলেই তারা বাড়তি উৎপাদনে সঙ্গে সঙ্গে হাত লাগাবে। গরিবদের টিকাকরণ সরকার নিষ্ঠার সঙ্গে চালিয়ে যাবে। অন্যদিকে দেশের জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশ যাতে উল্লেখিত অত্যন্ত কম দামে টিকার নাগাল পায় তাও সরকারের দেখা দরকার।

যা খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে বহু বড়ো ও মাঝারি মাপের উদ্যোগপতিরা তাদের কর্মীদের

টিকাকরণের খরচা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। এটা তারা Corporate Social Responsibility-র অঙ্গ হিসেবে মনে করছে। লক্ষ লক্ষ মধ্যবিত্ত পরিবার নিজেরা তাদের সঙ্গে থাকা গৃহকর্ম সহায়কদের মাথাপিছু ৪০০ টাকা খরচ করে টিকা দিতে অত্যন্ত উন্মুখ। এছাড়াও আমার কোনো সন্দেহ নেই যে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় বিভিন্ন দাতব্য সংস্থাকে অর্থ দিয়ে গণটিকাকরণ প্রকল্পকে সফল করতে নিশ্চিত এগিয়ে আসবে। আমাদের দেশে কয়েক লক্ষ হাসপাতাল, নার্সিং হোম, সেবা কেন্দ্র থেকে মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে যারা ১ মাসের মধ্যে দেশের অর্ধেক জনসংখ্যাকে টিকা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

এবার এই পরিকল্পনার বিস্তৃত রূপটি একটু পর্যালোচনা করা যেতে পারে। টিকাকরণের একেবারে প্রাথমিক স্তরে আমাদের ৩৪ হাজার ৭২২ জন নার্সের প্রয়োজন হবে যারা দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজ করতে সক্ষম। এরাই ৫০ কোটি লোককে ৩০ দিনে কীভাবে টিকে দেবে তা বলছি। ধরে নেওয়া যায় একটা ইনজেকশন দিতে সময় লাগা উচিত ১ মিনিট। এই হিসেব অনুযায়ী যে কোনো একটি বড়ো হাসপাতালে ৫০ জন নার্স ৮ ঘণ্টায় ২৪ হাজার লোককে টিকা দিতে পারবে। এই কাজটা করতে গেলে তাদের প্রাত্যহিক রুটিনে কোনো বাধা পড়বে না। আর যদি আমরা এমনটা ধরে নিই যে পুরোটার জায়গায় একমাসে অর্ধেক সংখ্যার টিকাকরণ হলো সেক্ষেত্রেও আমরা যুদ্ধে জিতে যাব। তবে কাজে সফল হতে গেলে আমাদের মজ্জাগত উদ্ভাবনী সক্ষমতার সাহায্য নিতেই হবে। টিকাকরণের প্রক্রিয়া অবশ্যই চলবে হাসপাতাল সংলগ্ন একটি খোলা জায়গায়। ইচ্ছুক ব্যক্তি অনেকেই তার সময় ঠিক করে রেখে নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট আগেই যেন পৌঁছে যান। এর ফলে অবাঞ্ছিত ভিড় এড়ানো যাবে। অপেক্ষমান ব্যক্তিদের জন্য ১০০টি চেয়ার রাখা দরকার। একজন নার্সকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়ার জন্য ৪ জন প্রশিক্ষিত সহকারী থাকবে যারা সিরিঞ্জের ভেতর ইজেকশনটি টানবে। একজন সহকারী গ্লাভস পরে স্পিরিট ও প্রয়োজনীয় তুলো নিয়ে প্রস্তুত থাকবে। নার্সের কাজ হবে একের পর এক রোগীকে কেবলমাত্র ইনজেকশনটি পুশ করে দেওয়া যতক্ষণ না ১০০টি চেয়ার খালি হয়। টিকা নেওয়ার পর ব্যক্তিরা নিকটবর্তী নির্দিষ্ট অঞ্চলে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করবে। এঁদের টিকা দেওয়ার প্রমাণ হিসেবে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আধার নম্বার নথিবদ্ধ করা হবে। ডাক্তার ও হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট খুব ভালো করেই জানেন যে টিকা হাসপাতালে এনে তা মানুষকে প্রয়োগ করার খরচ জনপ্রতি ১০০ টাকা হলে আদৌ পোষাবে না, তাই আবার ৫০ কোটি লোককে দেওয়ার জন্য মোট খরচ পড়বে ২০০ টাকার আশপাশে। কিন্তু এই সূত্রে আমাকে বলতেই হবে যে আমি বহু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও বিভিন্ন নার্সিং হোম পরিচালকদের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনার সময় অভিভূত হয়ে পড়েছি। তারা সকলে এক বাক্যে এগিয়ে এসে বলেছেন দেশের এই সংকট মুহূর্তে তারা টিকা প্রতি ১০০ টাকা পেলেই এই মহান কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে প্রস্তুত। এর ফরে টিকাকরণের খরচা ৪০০ টাকাতেই স্থিত হয়ে গেল।

আবার বলছি, এই করোনা খুব তাড়াতাড়ি যাবে না। করোনার সামগ্রিক টিকাকরণ একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। তবে একবার ৫০ কোটি মানুষের টিকাকরণ হয়ে গেলে বাজার নিয়ন্ত্রকদের হাতে অনেক সময় থাকবে টিকার ভবিষ্যৎ দাম নির্ধারণের। আমি এমন বহু লোকের সঙ্গে কথা বলেছি যারা বলেছে ৫০ কোটি লোকের টিকাকরণ এক্ষুনি সম্ভব নয়। এই ব্যক্তিরাই বরাবর বলে এসেছিল ৫০ কোটি লোকের স্বাস্থ্যবিমা করা অসম্ভব। আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী বিশ্বাস করেন ইতিবাচকতায়। তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারও এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমাদের ডাক্তারবাবুরা, নার্স বাহিনী, স্বাস্থ্য কলাকুশলী ও স্বাস্থ্যকর্মীরা তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় গত ১ বছরে এক অসাধ্যসাধন করে লক্ষ লক্ষ মূল্যবান জীবন বাঁচিয়েছেন। করোনা সংক্রান্ত সেবা দিতে দিতে তাঁরা আজ পরিশ্রান্ত, তাঁরা তাঁদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চান। তাই আমরা কোনো ভাবেই আবার একবার করোনার নতুন ঢেউ ও লকডাউনের মোকাবিলা করতে তৈরি নই। যদি আমরা আলোচিত কাজটা করে বিশ্বকে দেখাতে পারি তাহলে এটাই প্রমাণ হবে যে স্বাস্থ্য কখনই একটি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে না।

শোকসংবাদ

কলকাতা মহানগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক অজয় গোয়েলের সহধর্মিণী মঞ্জু গোয়েল গত ৩১ জানুয়ারি দীর্ঘ রোগভোগের পর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তিনি তাঁর স্বামী, ১ পুত্র ও পুত্রবধূ, ১ কন্যা ও জামাতা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

কলকাতা মহানগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক কর্নেল সব্যসাচী বাগচীর সহধর্মিণী রেবা বাগচী দীর্ঘরোগ ভোগের পর গত ১৬ ফেব্রুয়ারি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি তাঁর স্বামী ১ পুত্র ও পুত্রবধূ এবং এক নাতি রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, শ্রীমতী বাগচী বাসন্তীদেবী কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী ৮ মার্চ স্বস্তিকা বিশেষ সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হবে। বিষয়— ‘পশ্চিমবঙ্গ কোন পথে’।

এই সংরক্ষণযোগ্য সংখ্যাটি সম্পূর্ণ রঙিন তো হবেই, সঙ্গে থাকবে অতিরিক্ত পৃষ্ঠাও। মূল্য ২৫ টাকা মাত্র।

প্রচার প্রতিনিধিরা তাঁদের প্রয়োজনীয় কপির সংখ্যা সত্বর জানান, যাতে সেই মতো পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হয়।

—স্বঃ সঃ

রম্যরচনা

জাতে মাতাল, তালে ঠিক

এক বেহদ্দ মাতাল রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে। এমন সময় গৌরীবাবু এলেন।

মাতাল— দাদা, রাজধানী কটায়?

গৌরীবাবু— ৬.২০

মাতাল— মুম্বই মেল?

গৌরীবাবু— ৭.২০

মাতাল— তুফান এক্সপ্রেস?

গৌরীবাবু— আরে মশাই, আপনি যাবেন কোথায়?

মাতাল— লাইন পার হব যে!

মেট্রোতে

রবীন্দ্র সরোবর ছাড়ার পর এক যাত্রী বললেন— দাদা, আপনি কি উত্তম কুমার?

— না, আমি ক্ষুদিরাম।

— একটু সাইড দেবেন দাদা। আসলে আমি উত্তম কুমার, পিছনে মাস্টারদা আর নেতাজী আছেন।

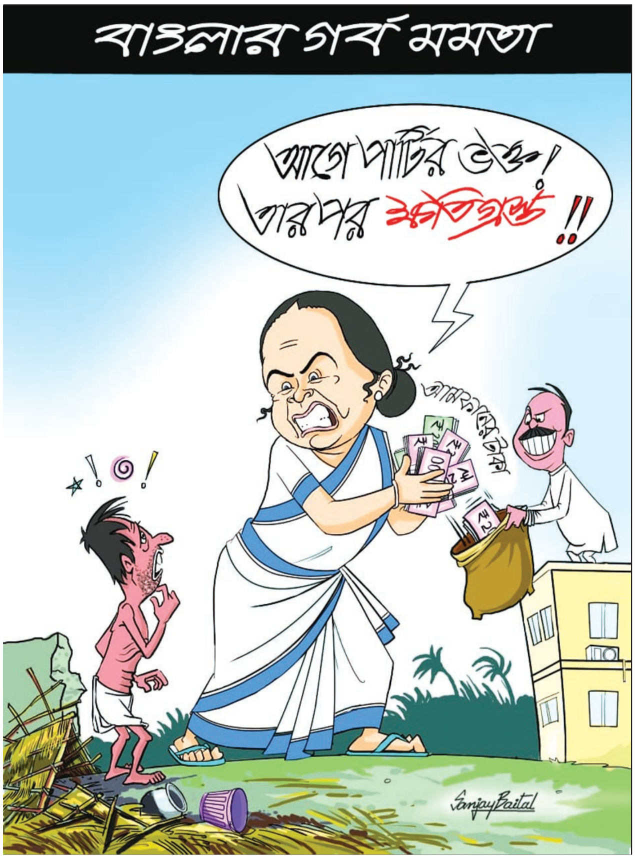

উবাচ

“যতদিন এই পদে থাকব, সংবিধানর রক্ষক হিসেবে কাজ করব। আমার সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। মনে রাখবেন, পশ্চিমবঙ্গের হৃতগৌরব ফিরিয়ে এনে সোনার বাঙ্গলা গড়তে হবে।”

জগদীপ ধনকর
রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

দঃ ২৪পরগনা জেলায় এক অনুষ্ঠানে।

“রোজ আমাকে মোদীজীকে গালিগালাজ করতে বলা হতো। কিন্তু সেটা আমার মূল্যবোধের সঙ্গে খাপ পায় না। যদি প্রধানমন্ত্রী ভালোকাজ করেন অবশ্যই আমাদের প্রশংসা করতে হবে। যদি সরকার ভুল কিছু করে সৌজন্যবোধ বজায় রেখে বলিষ্ঠভাবে বিরোধিতা করতে হবে।”

দীনেশ ত্রিবেদী
প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ

রাজ্যসভা ও দল থেকে পদত্যাগের পর মন্তব্য।

“পুলওয়ামা হামলার যন্ত্রণা কোনো ভারতীয় কোনোদিন ভুলতে পারে না। আমরা আমাদের সেনা জওয়ানদের জন্য গর্বিত। তাঁদের বীরত্ব আমাদের যুগ যুগ ধরে অনুপ্রেরণা দেবে।”

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

পুলওয়ামা হামলা দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে হতাত্মা জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে।

“আমফানের মতো দুর্যোগের সময় পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে জল ও বিদ্যুৎ দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। তাতে তিনি কোনো ধর্ম দেখেননি। ধর্ম ও জাতপাতের রাজনীতি নিয়ে যারা খেলা করছে তাদের দিন শেষ হতে চলেছে।”

গজেন্দ্র সিংহ শেখাওয়াত
কেন্দ্রীয় জল সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী

বসিরহাটে পরিবর্তনযাত্রার কর্মসূচিতে সাংবাদিক সম্মেলনে।

মতুয়ারা গভীর রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার

কে.এন. মণ্ডল

ওপার বাঙ্গলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে, বিশেষত ১৯৭১-এ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে, ভারতে আগত উদ্বাস্তুদের গরিষ্ঠাংশ নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই মতুয়া। হরিনামে মাতোয়ারা (হরিচাঁদ ঠাকুরের অনুসারী) মানুষ মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। এরা মূলত পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোর, ঢাকা জেলা থেকে আগত এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও, অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের দুই ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ইত্যাদি সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বসবাস করছেন। স্বাধীনোত্তরকালে প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ অন্ধকারে থাকলেও, গত এক দশক যাবৎ এঁরা প্রচারের আলোয়— রাজনীতির বোড়ে। এদের মূলধন করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার ভাবনা প্রথম মাথায় আসে বঙ্গেশ্বরীর মাথায়। তৃণমূল নেত্রীর পদাঙ্কানুসারী বামপন্থীরা এ রাস্তা মাড়ানোর চেষ্টা করেও বিফল। কারণ প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি এবং প্রকল্প উদ্ভাবনের প্রতিযোগিতায় তারা অনেক পিছিয়ে। তাছাড়া, বামবন্ধুরা না আছেন রাজ্যে বা কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন--- অতএব ডোল রাজনীতির সুযোগ তাঁদের নেই। হঠাৎ কী এমন হলো যে উদ্বাস্তুরা— যাঁদের অনেকের অতীত বামপন্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তাঁদের বেশিরভাগ ডানপন্থী বিজেপির দিকে ঝুঁকলেন? জাতি পরিক্রমায় পিছিয়ে থাকা এবং আর্থিক দিক থেকে প্রায় নিঃস্ব এই মতুয়াদের রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হলেও, তাদের মূল উদ্বেগ ভারতীয় জাতিসত্তার স্বীকৃতি— অর্থাৎ নাগরিকত্বের দাবিটি উপেক্ষিত থেকে যায়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত নরেন্দ্র দামোদর ভাই মোদীর নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী বিজেপি সরকারের কৃতিত্ব এটাই উদ্বাস্তুদের মূল দাবি ‘নাগরিকত্বের’ বিষয়টি বুঝতে পারা।

National Register for Citizen (NRC) অসমে ১৯৫১ সালে চালু হলেও, সারা ভারতবর্ষে তা চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ২০০৩ সালে। যদিও এখনো তা অসম ব্যতীত কোথাও কার্যকর করা হয়নি, তাও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। ভারতবর্ষে নাগরিক আইনটি প্রবর্তিত হয় ১৯৫৫ সালে, দেশভাগের প্রাথমিক চাপ সামলে। দেশভাগের বলি লক্ষ লক্ষ হিন্দু শরণার্থী ভারতে প্রবেশ করায় নাগরিকত্ব প্রদানের বিষয়টি সামনে আসে। অর্থাৎ দেশভাগ জনিত কারণে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এবং আইনি স্বীকৃতির প্রয়োজনেই স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে নাগরিকত্ব আইন প্রণীত হয়। জাতিসঙ্ঘের UNHRC (United Nations Commission for Human Rights)- এর সংজ্ঞানুসারে ধর্মীয় নির্যাতন, জাতিদাঙ্গা বা বিদ্বেষের কারণে বিতাড়িত মানুষেরা জীবনের ঝুঁকির কারণে স্বদেশে ফিরতে না চাইলে, যে দেশে তারা আশ্রয় চান সেই দেশ ওই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেবে--- প্রয়োজনে জাতিসঙ্ঘের সাহায্য নিতে পারে। ঠিক এই জায়গাটিতেই উদ্বাস্তু ও অনুপ্রবেশকারীর পার্থক্য। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের পরে ভারতে আগত উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বদান বন্ধ থাকে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে এবং তাতে আইনি শিলমোহর পড়ে রাজীব গান্ধীর সঙ্গে অসম গণপরিষদের চুক্তির পরে। অথচ ধর্মনিরপেক্ষ নতুন বাংলাদেশ অনতিবিলম্বেই ইসলামিক বাংলাদেশে রূপ নেওয়ায়, ভারতে উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ হওয়া তো দূর— বরং অধিকতর গতি পায়। বিভিন্ন উদ্বাস্তু সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের লড়াই চালিয়ে যায়, বিরোধী নেতাদের মধ্যে অসমের প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ, কংগ্রেসের

কেন্দ্রীয় কার্যালয়

সংসদীয় দলনেতা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ, কমিউনিস্ট নেতা সীতারাম ইয়েচুরি নানা সময়ে উদ্বাস্তুদের জন্য নাগরিকত্ব প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থার দাবি জানান। যদিও তাঁদের দলের ভূমিকা বর্তমানে ভিন্নতর। সম্ভবত ওই নেতৃবর্গ তখন ভাবতেই পারেননি যে নরেন্দ্র মোদী সরকার নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের মতো এরকম একটি সাহসিক পদক্ষেপ নেবেন।

এখন দেখা যাক, নাগরিক আইনে কীই-বা সংযোজিত হলো। আমরা জানি, ২০১৯-এর সংশোধনের পূর্বেই আরও ৫ বার নাগরিক আইন সংশোধিত হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের অ্যার্টিকেল ৫ থেকে ১১ পর্যন্ত জুড়ে রয়েছে এই আইনটির পরিধি। বর্তমান সংশোধনীতে একটি বিশেষ ব্যবস্থা আনা হয়েছে নাগরিকত্ব আইনে, বাকি সব ধারা অপরিবর্তিত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ধারাগুলির উল্লেখ বিষয়টি অনুধাবনে সহায়ক হবে :

(১) ভারতের সংবিধান কার্যকর হওয়ার দিন থেকে (২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০) ভারতে বসবাসকারী ও জন্মগ্রহণ করা প্রত্যেকেই ভারতের নাগরিক।

(২) অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করা যে কোনো ব্যক্তি বা তার পিতা/মাতা এবং পিতামহ/পিতামহীর জন্ম ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০ সনের পূর্বে হলে, তাঁরা ভারতের নাগরিকত্বের দাবিদার। তবে ভারত থেকে পাকিস্তানে চলে যাওয়া ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়।

(৩) ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০ থেকে ১ জুলাই ১৯৮৭ পর্যন্ত জাতিধর্ম নির্বিশেষে জন্মগ্রহণ করা সকল সন্তানেরা ভারতের নাগরিক।

(৪) ২ জুলাই ১৯৮৭ থেকে ৩ ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করা সন্তানদের মাতা/পিতার যে কোনো একজনকে ভারতের নাগরিক হতে হবে। তারপর থেকে ভারতের নাগরিকত্বের দাবিদারের পিতা/ মাতার দুজনকেই ভারতের নাগরিক হতে হবে অথবা একজনকে নাগরিক আর অন্যজন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী নন এমন হতে হবে— এ ধারাটিও ভারতের মুসলমান-সহ ভারতের সকলের জন্য উন্মুক্ত (Citizenship Amendment Act 2003)।

(৫) বর্তমান সংশোধনীতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় কারণে নির্যাতিত হয়ে অথবা অত্যাচারের কারণে দেশত্যাগী হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন, পার্সি ও শিখ ধর্মের মানুষ, যারা ১৯৭১-এর ২৪ মার্চের পরে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন, এমন ব্যক্তিদের Indian Passport Act 1920 এবং Foreigners Act 1946-এর আওতা থেকে অব্যাহতি দিয়ে, ভারতে কমপক্ষে ৬ বছর ধরে বসবাস করছেন— এমন মানুষদের নাগরিকত্ব দানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অপরপক্ষে ১১ বছর ভারতে বসবাসকারী বিদেশিদের নাগরিকত্ব প্রদানের নিয়ম যথাপূর্ব রয়েছে, এ আইনে মুসলমানদেরও নাগরিকত্ব পাওয়া বাধা নেই। উল্লেখ্য, গত ৩ বছরে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আগত ৪ হাজার মুসলমানকে ভারতের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়েছে। এমনকী, বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত বিশিষ্ট প্রতিবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিনকেও ভারতে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ধর্মীয় পরিচয়ে নাগরিকত্ব আইনে সংশোধনী আনার অভিযোগ দুরভিসন্ধিমূলক এবং রাজনৈতিক তোষণের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। এই সংশোধনীর মূল উদ্দেশ্য পাঁচ দশক থেকে ঝুলে থাকা উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের দাবির মানবিক সমাধান এবং দেশভাগের শিকার কোটি কোটি মানুষের প্রতি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন। হিন্দু-বৌদ্ধরা অত্যাচারের শিকার হওয়ায় পাকিস্তান/ বাংলাদেশ আজ প্রায় হিন্দু শূন্য। ১৯৪১ সালের জনগণনায় পূর্ববঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা ২৮ শতাংশ থাকলেও বর্তমানে তা ৮ শতাংশের নীচে নেমে এসেছে— তা কীসের ইঙ্গিতবাহী? বিরোধী রাজনীতিকরা শুধু তোষণ রাজনীতির কারণে উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের বিরোধিতা করছেন আর কোরাস গাইছেন ‘আমরা সবাই নাগরিক’। তাই যদি হয়, অসমে ১৯ লক্ষ মানুষ কেন এনআরসি-র বাইরে থাকলেন— ভোটার কার্ড, আধার কার্ড থাকা সত্ত্বেও? এর একটাই কারণ, ওই সমস্ত কাগজ নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। ভবিষ্যতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে (যেমন অসম) বা অন্য কোনোভাবে যদি পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি চালু হয়, তাহলে প্রায় ২ কোটি মানুষ ফের দেশহীন হয়ে পড়বেন। নতুন নাগরিকত্ব আইন উদ্বাস্তুদের অসমের মতো পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই দুর্ভাগা উদ্বাস্তুদের ভোটের বোড়ে হিসেবে ব্যবহার করবেন বলে তাদের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত রাখতে চাইছেন। অন্যথায় ১১ ডিসেম্বর ২০১৯-এ নাগরিকত্ব আইন সংসদে পাশ হওয়ার পরে মুসলমানদের উসকে সপ্তাহ ধরে হিংসাত্মক আন্দোলনে ইন্ধন জোগাতেন না রাজনীতিকরা। বিপুল সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস হওয়ার দায় স্বীকার করেননি কেউ। বরং পশ্চিমবঙ্গে ভোটের আগে মতুয়াদের বিভ্রান্ত করে দাবার ঘুঁটি সাজাচ্ছেন তাঁরা। অবশ্য এই বিভ্রান্তির দায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকও এড়াতে পারেন না। কারণ ২০১৯-এর ১১ ডিসেম্বর এই আইন সংসদে পাশ হওয়ার পরের দিনই ১২ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। এক মাসের মধ্যে ১০ জানুয়ারি ২০২০-তে আইন কার্যকর করার গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। কিছুদিনের মধ্যেই করোনা অতিমারীর প্রকোপে ভারতবর্ষ গভীর সংকটে পড়ে— তবুও বছরাধিক কালের মধ্যে এর পদ্ধতি তৈরি না হওয়ায় উদ্বাস্তুদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়, যা কাজে লাগাতে মাঠে নেমে পড়েন রাজনীতির কারবারিরা। তবুও, আইনটির বিরোধিতায় হিংস্র আন্দোলন করেছে এবং আজও বিরোধিতার লাইনে অটল। সুতরাং ওদের প্ররোচনায় পা দিলে কিন্তু উদ্বাস্তুরা নাগরিক আইনের গুরুত্ব সম্পর্কে অকৃতজ্ঞর মতো আত্মঘাতী কাজে নিমজ্জিত হবেন। মনে রাখতে হবে, নাগরিকত্ব দানের আইনি প্রক্রিয়া যেদিনই শুরু হউক না কেন— উদ্বাস্তুরা কিন্তু আইনগতভাবে সুরক্ষিত এবং নাগরিক হিসেবে স্বীকৃত।

নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহদের ঝুঁকি নিয়ে নাগরিক আইন পাশের মতো সাহসিক ঘটনা ইতিহাস স্মরণ রাখবে, মনে রাখবে উদ্বাস্তুদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও।

(লেখক ভারতীয় স্টেটব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য প্রবন্ধক)

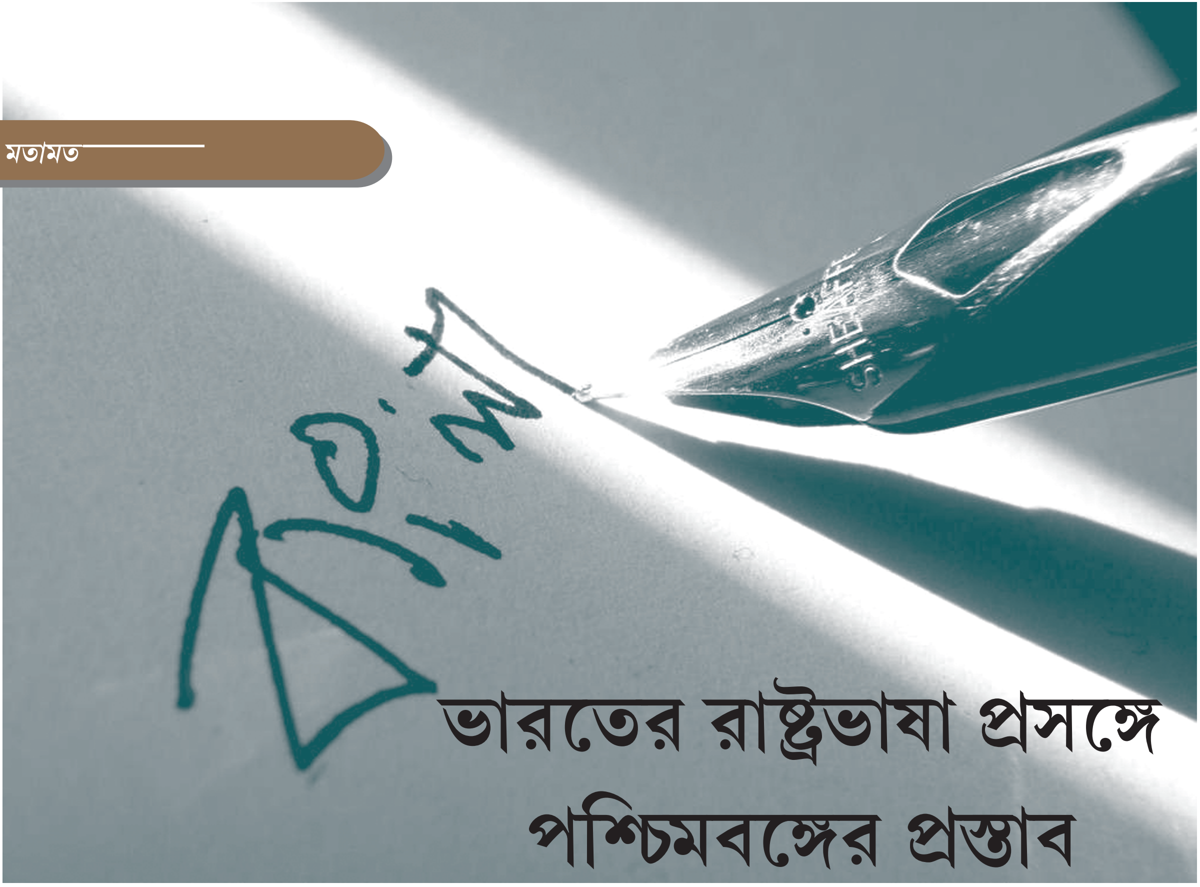

ভারতের রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তাব

বন্দে মাতরম্ ও জনগণমন— সংগীত জাতীয় সংগীত ও জাতীয় স্তোত্র হিসেবে ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত তা বাংলা ভাষায় রচিত। বাঙ্গালির জাতীয় ভাবনার এমন নিবিড় সমৃদ্ধতা নিয়েই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার দাবি জানানো হয়েছে বার বার। কিন্তু ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গভাষার অপরিসীম অবদানের কথায় স্বাধীন ভারতের গণপরিষদের মহান নেতৃবর্গ গুরুত্ব দেননি।

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

সংবিধান অনুযায়ী ভারতের কোনও রাষ্ট্রভাষা নেই। হিন্দি এদেশের সরকারি ভাষা। সহকারী ভাষা ইংরেজি। হিন্দিভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার পরিকল্পনা ছিল— অখণ্ড ভারতে এবং স্বাধীনতার অনেক আগে থাকেই। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উক্তি স্মরণীয়। ১৯২৭ সালে আগ্রায় অনুষ্ঠিত হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ বলেন, ‘হিন্দিভাষা ভাবী রাষ্ট্রভাষা বলিয়া ঘোষিত হইতেছে। রাষ্ট্রভাষা কেবল রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনীয়তায় সিদ্ধ হয় না, সাহিত্যের দিক হইতে তাহাকে তাহার উপযোগিতা দেখাইতে হইবে। ইংরেজিভাষা যে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে, সে তাহার বাণিজ্যবিস্তার ও রাজ্য জয়ের জন্য নহে, সে ভাষায় বহু কবি সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি কেবল সাহিত্যের দাবি পূরণ করিয়া মিটানো যায়।’ রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে দুটি বিষয় স্বচ্ছ যে, স্বাধীনতার বহু আগে থেকেই হিন্দিভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার পরিকল্পনা ছিল এবং কেবলমাত্র সাহিত্যগুণের বিচারে ইংরেজি ভাষাকে তিনি রাষ্ট্রভাষা করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। বঙ্গভাষার পূজারি হয়েও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় ভারতবর্ষের ঐক্যভাবনার বিষয় অনুভব করেই এমন কথা বলেছিলেন সেদিন।

২

ভারতবর্ষে বহু-ভাষা প্রচলিত। ভাষা বৈচিত্র্যের কারণেই ‘এক জাতি এক ভাষা’— এমন ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ আজও গড়ে উঠতে পারেনি। স্বাধীনতার দু’দশক পূর্বে পরিকল্পিত হলেও হিন্দিভাষা স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা নয়, সরকারি ভাষা; এবং সরকারি তালিকায় বাংলা-সহ আরও একগুচ্ছ ভাষার নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মনে করেন--- ভারতের ভাষাসমূহের মধ্যে বাংলাভাষার উৎকর্ষ গুণ সর্বাপেক্ষা বেশি। সেই ঐতিহ্য অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে দাবি, বাংলা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা হোক। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে প্রথম আইনসঙ্গত দাবি জানিয়েছিলেন সর্বাধিনায়ক সতীশচন্দ্র সামন্ত; যিনি ১৯৪২ সালে পরাধীন ভারতে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার গঠনের সাহস ও সক্ষমতা প্রমাণ করেছিলেন। স্বাধীনতার দুটি বছর তখন অতিক্রান্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানভূম অঞ্চলে তখন বঙ্গভাষা আন্দোলন শুরু হয়েছে এবং সদ্য বিচ্ছিন্ন পূর্ববঙ্গে শুরু হয়েছে বঙ্গভাষা বিপ্লব এবং নতুন ভারত সরকার দেশে ভাষাভিত্তিক ভূগোলের কাজ শুরু করেছেন। সেই সময়, দিল্লিতে গণপরিষদের সভাকক্ষে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সামনে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব পেশ করা হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯, বাংলা ভাষা সম্পর্কে ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য সতীশচন্দ্র সামন্ত গণপরিষদে ভাষণে বলেন—

২২৩ সংখ্যক প্রস্তাবটিতে আমি প্রস্তাব করেছি যে বাংলাকে ভারতের সরকারি জাতীয়ভাষা রূপে গ্রহণ করা উচিত। ...বাংলা একটি সমৃদ্ধ ভাষা, এর ইতিহাস খুব প্রাচীন;

এর সাহিত্য উৎকৃষ্ট এবং সুপ্রাচীন; এর ভাষাতত্ত্ব এবং এই জাতীয় বিষয় সবই আছে। সুতরাং পরিষদের পক্ষে এই ভাষা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে বাধা নেই, এবং আমার প্রস্তাবটি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ভারতের জনসাধারণের পক্ষে সে ভাষা সহজবোধ্য, আমি জানি আমার অধিকাংশ বন্ধু সেই ভাষাই গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। ...আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে— অক্সফোর্ড, ওয়ারস প্রভৃতি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষা দেওয়া হয়--- এমনকী হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রতত্ত্বের পঠন পাঠন প্রচলিত আছে। প্যারিস, মিউনিখ, মস্কো ও রোমের ভাষা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান সমূহে বাংলা স্বীকৃতি পেয়েছে। তাই আমি বলতে চাই বাংলা ভাষার কিছু আন্তর্জাতিক মর্যাদা আছে।

তিনি আরও বলেছেন, ‘বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অপ্রতুলতা নেই— আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শান্তিনিকেতনের জগদানন্দ রায়, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ মনীষী এই পরিভাষা রচনা করেছেন। ‘জ্ঞান-বিজ্ঞান’ নামক বাংলা মাসিক পত্রিকা এই বিষয়ের উন্নতি সাধনে যথেষ্ট তৎপর। বৈজ্ঞানিক ও টেকনিক্যাল শব্দের যথেষ্ট প্রাচুর্য বাংলা ভাষায় পরিলক্ষিত হয়।’ তিনি বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের নাম সকলের সুপরিচিত--- কেবল ভারতে নয়, সারা পৃথিবীতে। এখানে পুরুষ কিংবা নারী এমন কেউ নেই যিনি তাঁর নাম শোনেননি। তাঁর কবিতা ও গান সকলের কণ্ঠস্থ, সকলেই তাঁর গান গেয়ে থাকে। বিশ্বের বহু ভাষায় এগুলি অনূদিত হয়েছে এবং সমাদৃত হয়েছে’। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা তুলে বলেছিলেন, ‘আমরা এখন একটি স্বাধীন জাতি এবং আমরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সেই বন্দে মাতরম্ গানটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে হাজার হাজার লোক আত্মদান করেছে। এই বন্দে মাতরমের জন্য হাজার হাজার লোক তাদের সম্পদ ও অনেক কিছু বিসর্জন দিয়েছে। ভারতের প্রত্যেকটি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এই সংগীত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের মাধ্যমে আমাদের দিয়েছিলেন এই অমর সংগীত। তাই আপনারা যখন আপনাদের জাতীয় এবং সরকারি ভাষার বিষয়টি বিবেচনা করবেন, তখন এই বিষয়টি সর্বতোভাবে স্মরণ রাখবেন।’

জাতির অস্তিত্ব তার ভাষায় এবং ঐতিহ্য তার সাহিত্যে। বাঙ্গালির অস্তিত্ব বহু বিস্তৃত এবং ঐতিহ্য জাতীয় সংগ্রামে ও জাতীয় ভাবনায় সমুন্নত। বন্দে মাতরম্ ও জনগণমন— সংগীত জাতীয় সংগীত ও জাতীয় স্তোত্র হিসেবে ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত তা বাংলা ভাষায় রচিত। বাঙ্গালির জাতীয় ভাবনার এমন নিবিড় সমৃদ্ধতা নিয়েই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার দাবি জানানো হয়েছে বার বার। কিন্তু ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গভাষার অপরিসীম অবদানের কথায় স্বাধীন ভারতের গণপরিষদের মহান নেতৃবর্গ গুরুত্ব দেননি। —সংবিধানের পাতায় লেখা হলো, হিন্দি হবে ভারতের মূল সরকারি ভাষা। লিখলেন— The progrssive use of the Hindi language for the official purposes of the Union. আর ইংরেজি থাকবে সরকারি ভাষা হিসেবে। পরবর্তী পনেরো বছরের জন্য এই আইন বলবৎ রাখা হয়। আরও বলা হয়, সরকারি কাজকর্মে হিন্দির ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধির পরামর্শ দিতে হবে এবং ইংরেজির ব্যবহার কমিয়ে আনার প্রস্তাব পেশ করতে হবে।

৩

১৯৫০ সালে সংবিধান মোতাবেক দেবনাগরী লিপিতে হিন্দি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণ করা হয় যদিও ২৬ জানুয়ারি ১৯৬৫ পর্যন্ত ইংরেজিকে সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়। সেই সূত্রে ১৯৪৬ সালের শেষ দিকে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার বন্ধ করার একটা প্রচেষ্টা করা হয়। ভারত সরকারের এমন প্রচেষ্টায় সমগ্র দক্ষিণ ভারতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। বিক্ষোভ দেখানো হয় মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, পঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, পুদুচেরি ও অন্ধ্রপ্রদেশে। কিছু বিক্ষোভ হিংসাত্মক হয়েও ওঠে। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি অনুসারে ভাষা আইনটি সংশোধন করা হয়। ঠিক হয় যতদিন পর্যন্ত সমস্ত রাজ্য হিন্দিকে তাদের রাজ্যের সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি না দিচ্ছে ততদিন ইংরেজি ভাষাকেও সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। কিন্তু একই সঙ্গে হিন্দির ব্যবহার বাড়ানোর প্রচেষ্টাও চালু রাখতে হবে।

দেশের এই ভাষা-সংকটের স্থায়ী সমস্যার সমাধানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন বসু ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা এখানে সবিশেষ উল্লেখযাগ্য। পাকিস্তানে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পেলে তারাশঙ্কর অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। ভাষণে, আলোচনায় এবং নানা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের তারুণ্যকে উদ্দীপ্ত ভাষায় অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে ও সমগ্র ভারতে বাংলাভাষা যাতে সগৌরবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার আসন লাভ করতে পারে তার জন্য তিনি সচেষ্টও হয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালে মানভূম ভাষা আন্দোলনের সময় তারাশঙ্কর পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন। বিশেষ কারণে পদত্যাগ পত্র দিয়ে বলেছিলেন, ‘আমার এই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়া আমাকে আমার বিবেক সম্মত মতামত ব্যক্ত করিতে সুযোগ দিলে আমি কৃতজ্ঞ হইব এবং নিজেকে ধন্য মনে করিব।’ ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রশতবর্ষের প্রাক্কালে মাতৃভাষার পূজারি তারাশঙ্কর বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষায় স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য অনভিজ্ঞ জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়কে এক দীর্ঘ চিঠি লেখেন। সংবাদপত্রে খোলা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—

‘১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই শুনিয়া আসিতেছি বাংলাভাষা প্রাদেশিক সরকারি ভাষার মর্যাদা পাইবে। তাহার পর আজ বারো বৎসর অতিক্রান্ত হইতে চলিল, ইতিমধ্যে বিধান সভায় ও পরিষদে বাংলাভাষাকে ইংরেজির সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীতেও কি তাহা কর্মে পরিণত হইবে না? ...মহাকবি তাঁহার সমগ্র জীবন যে ভাষায় অমর সাহিত্য রচনা করিয়া তাহাকে মহিমময়ী করিয়া তোলেন তিনি কি আজও সমগ্র প্রদেশ বিস্তারী রাষ্ট্রীয় প্রাসাদ সমূহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট ইংরেজি ভাষার সম্মুখে আবেদন প্রার্থিনীর মতো দাঁড়াইয়া থাকিবেন? রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সম্পর্কে যে সব নির্দেশপত্র সরকারি দপ্তর হইতে প্রচারিত হইবে তাহা কি ইংরেজি ভাষায় লিখিত হইবে? বাংলাদেশে কি এমন বৎসরেও প্রাদেশিক সরকারি ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার স্থান হইবে না?

আজ স্বাধীনতার বারো বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, রবীন্দ্র জন্মশত- বার্ষিকীও ঠিক সেই লগ্নে সমাগত। আজ আমাদের বাঙ্গালির বিশেষ করে ইংরেজি অনভিজ্ঞ বাঙ্গালির দাবি প্রত্যাশা এই যে জননী বঙ্গভাষার সিংহাসনে অভিষেক এই লগ্নে সম্পন্ন করুন। সমগ্র প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় কর্মে বাংলা ভাষা তাঁহার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হউন। আপনার দ্বারাই তাহা নিষ্পন্ন হউক।'

১৯৬৫ সালের ৩০ মার্চ, 'জাতীয় সংগীতের ভাষা সরকারি ভাষা হবে না কেন'— এই শিরোনামে দক্ষিণারঞ্জন বসু 'যুগান্তর' পত্রিকায় একটি নিবন্ধ লেখেন। ভাষাকেন্দ্রিক জাতীয় পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে এক মধ্যপন্থা অবলম্বনে বাংলা-সহ পঞ্চ রাষ্ট্রভাষা পরিকল্পনার প্রস্তাব জানিয়েছিলেন। প্রস্তাবে ছিল—

হিন্দি ভাষীদের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি স্বীকার করে নিয়ে এবং জাতীয় অবমাননা থেকে জাতীয় সংগীতকে মুক্তি দেবার জন্যে ও বাংলা ভাষার গুণগত শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে উত্তর ভারতের উক্ত দুই ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা হোক। দক্ষিণের সুপ্রাচীন ও প্রসাদগুণে শ্রেষ্ঠ দুইটি ভাষা তামিল ও তেলুগুকে এবং আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ও তার বিপুল অবদানের কথা স্মরণে ইংরেজি ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা করা হোক।

এই পঞ্চ রাষ্ট্রভাষার প্রস্তাবটি প্রকাশিত হবার পর দীর্ঘদিন ধরে এ প্রস্তাবের সমর্থনে হিন্দি-সহ বিভিন্ন ভাষাভাষীর কাছ থেকে নিবন্ধকারের কাছে ক্রমাগত চিঠিপত্র আসতে থাকে। সাহিত্যিক শিক্ষাব্রতী প্রভৃতি বুদ্ধিজীবী মহল থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মহলেও এই বিষয় নিয়ে বছর দুই আলোড়ন চলে। যার ফলে 'ভারতের রাষ্ট্রভাষা' নামে রেকর্ড হিসেবে একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন বলে নিবন্ধকার দক্ষিণারঞ্জন বসু জানিয়েছেন। দক্ষিণারঞ্জন বসুর এই পঞ্চ রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক প্রস্তাবটির মূল্যায়নে কলম ধরেছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন তিনি ভারতের রাজ্যসভার সদস্য। ১৭ এবং ২৪ এপ্রিল ১৯৬৫, দুই সপ্তাহে দু'দিন 'যুগান্তর' পত্রিকায় পঞ্চ রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক প্রস্তাব সম্পর্কে তারাশঙ্কর যে কথা লিখেছিলেন তার মূল বিষয় তুলে ধরা হচ্ছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

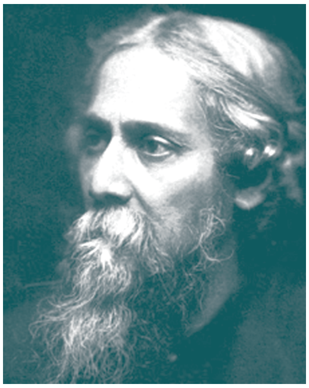

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'শ্রীমান দক্ষিণারঞ্জন বসুর রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক প্রস্তাবটি অত্যন্ত সুযুক্তিপূর্ণ। তাঁর প্রস্তাবের ভিত্তি অত্যন্ত দৃঢ়। বাংলা ভাষা বিষয়ক যে প্রস্তাবটি— এর পিছনে যে যুক্তি সে যুক্তির দিকে এতকাল ধরে কেন কারুর দৃষ্টিনিবদ্ধ হয়নি তার কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা— এ পবিত্র বস্তু। জাতীয় সংগীতের ভাষাকে সম্মানিত আসনের পাশে ম্লানমুখী তাম্বুলকরঙ্ক বাহিনীর মতো দাঁড় করিয়ে রাখলে জাতীয় সংগীতটিকেই প্রকারান্তরে অসম্মান করা হয় না?'

লিখেছিলেন, 'আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সময়ে আমার এই যুক্তির প্রতি উদাসীন থেকেছি। ভারতবর্ষ যদি বিভক্ত না হতো তবে বাংলা ভাষা হতো আট- ন' কোটি মানুষের ভাষা। সমগ্র ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে থাকা বাঙ্গালিকে গণনার মধ্যে আনলে আরও বেশি হতো। ...ইংরেজি ভাষা থেকে কম হলেও ভারতীয় ভাষার মধ্যে তার উৎকর্ষ গুণ সকলের থেকে বেশি একথা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং দাবি তার অন্যায্য নয়'।

বাংলাভাষার সপক্ষে ঐতিহ্য অনুসরণের কথা বললেও দক্ষিণারঞ্জন বসু ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে জাতিগত সংকীর্ণতাবোধ কাজ করেনি। তাই তাঁরা পঞ্চ-রাষ্ট্রভাষার কথা বলেছেন। এ বিষয়ে তারাশঙ্করের যুক্তি ছিল—

'বাংলা বা হিন্দি কেন, ভারতবর্ষের ভাষাসমূহের মধ্যে কোনো একটি ভাষা ভারতের রাষ্ট্রভাষা হতে পারে না। মৌর্য যুগ গুপ্ত যুগ মুসলমান যুগ এবং ইংরেজ আমলে অখণ্ড ভারত এক দেশে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ এবং তখন রাষ্ট্রভাষার পরিবর্তে ছিল রাজভাষা। স্বাধীন ভারতে একচ্ছত্র তথা একের জন্য রাজসিংহাসন পাতা নেই। আজ প্রদেশের দাবি মানতে তাদের যোগ্য স্বীকৃতি দিতে বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধি দিয়ে মন্ত্রীমণ্ডলীর অলিখিত বিধান মানতে হয়। সেখানে ভাষার ক্ষেত্রে একটি ভাষাকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করে তুলে তাকে সিংহাসনে বসাবার এই রীতি বা নীতি অগণতান্ত্রিক এবং মানুষকে বিদ্রোহী করে তোলার মতো একটি ব্যবস্থা তাতে সন্দেহ নেই'।

ভারতবর্ষের রাজভাষা হিসেবে প্রথমে হিন্দি ও ইংরেজি এবং পরে ১৯৬৫ থেকে কেবলমাত্র হিন্দি ভাষা গ্রহণের বিষয়টি সংবিধানে স্বীকৃত হলেও সেখানে যুক্তি অপেক্ষা পূর্ব-পরিকল্পনা এবং আবেগ অধিক গুরুত্ব পেয়েছিল। ১৯৪৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর সতীশচন্দ্র সামন্ত বাংলাভাষার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেও— রাষ্ট্রভাষার সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিন-চতুর্থাংশ ভোটাধিক্যের আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু ভোট হয়নি। সেইদিনই প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর ভাষণের পর সকলে হিন্দিকে জাতীয় ভাষা রূপে গ্রহণ করবার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

কেবলমাত্র ভাষার দাবিতেই অসম অন্ধ্রপ্রদেশ-সহ দক্ষিণ ভারতের বিদ্রোহ এবং তার রক্তাক্ত ইতিহাসের কথা আমাদের অজানা নয়। কেবলমাত্র ভাষার দাবিতেই স্বতন্ত্র দেশের কথাও বিশ্ব ইতিহাসে রয়েছে। ভারতবর্ষের পরিণাম সম্পর্কেও তেমন ইঙ্গিত রয়েছে তারাশঙ্করের কথায়।

(লেখক বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং গবেষক)

বঙ্গ রাজনীতিতে কদর্য ভাষার রমরমা

গুন্ডা, দাঙ্গাবাজ, কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরাব, কাঁকরের লাড্ডু খাওয়াব, হরিদাস পাল, তুই-তুমি ইত্যাদি...

মণীন্দ্রনাথ সাহা

একুশের বিধানসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে রাজ্য রাজনীতির কুশীলবরা ততই ভাষার সংযম হারাচ্ছেন। কোনো জনসভায় যা বলা উচিত নয়, তাই তারা নির্দ্বিধায় বলে চলেছেন। আর তাই নিয়েই ঝড় উঠেছে বঙ্গ রাজনীতির আকাশে।

২০১৪ সালের লোকসভার ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী এবং অন্যান্য বিজেপি নেতাদের প্রতি অকথা-কুকথা প্রয়োগ করেছিলেন বা এখনও করেন তা শুনে ইতরজনেরাও বোধহয় লজ্জা পেয়েছিলেন। একজন মুখ্যমন্ত্রী যদি এভাবে বিরোধী দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের রকের ভাষায় গালাগালি করেন, তাহলে তাঁর উদ্দেশে বলতেই হয়— 'ছিঃ।' মুখ্যমন্ত্রীর ওই সমস্ত ভাষা প্রয়োগ অনুকরণ করা শিখেছেন তাঁরই ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

সম্প্রতি কাঁথিতে ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ বলেন— 'আয়, তোর বাপকে গিয়ে বল, বাড়ির পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। যা করার কর। আয়, হিম্মত আছে? এই মেদিনীপুরের মাটিতে, তোমার মাটিতে, তোমার পাড়ায় দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে যাচ্ছি।' এই হলো তাঁর ভাষা।

তারই উত্তরে বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক টুইটে লিখেছেন— 'কয়লা মাফিয়া, সোনা মাফিয়া, বালি মাফিয়া, গোরু পাচারকারী ও সিন্ডিকেট রাজের তথাকথিত হোতা দেখুন, কী ধরনের ভাষায় কথা বলছেন। বাছা, রাবণের অহংকারও কিন্তু টেকেনি।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মোদীজীর উদ্দেশে গুন্ডা, দাঙ্গাবাজ, কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরাব, কাঁকরের লাড্ডু খাওয়াব, হরিদাস পাল, তুই-তুমি ইত্যাদি বাছাবাছা শব্দ দিয়ে আক্রমণ করেছেন, মোদীজী তাঁর উত্তরে মুখ্যমন্ত্রীকে মমতাদিদি সম্বোধন করে বলেছিলেন— 'দিদি বলেছেন, আমার কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরাবেন। কিন্তু দিদি সেই দড়ি কিনতে যে টেন্ডার ডাকতে হবে, আর তাতে দুর্নীতি হবে'।

একটু ভেবে দেখুন, মুখ্যমন্ত্রী যেমন গরিব ঘরে জন্ম নিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীরও তেমনি গরিব ঘরে জন্ম। গরিব ঘরে জন্মগ্রহণ করা কোনো দোষের নয়। সংসারের তাড়নায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন এক সময়ে দুধ বিক্রি করেছেন, ঠিক তেমনি নরেন্দ্র মোদীও চা বিক্রি করেছেন। অথচ দুজনের বাচনভঙ্গিতে, আচার-ব্যবহারে আকাশ পাতাল তফাত। অনেকেই বলে থাকেন, নরেন্দ্র মোদী শৈশবকাল থেকেই অত্যন্ত সৎ, উদার, ত্যাগী এবং একমাত্র দেশপ্রেমী সংগঠন— রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সাহচর্যে বড়ো হয়েছেন। তাঁর জন্যই শাসন প্রণালী ও সুললিত বাচনভঙ্গি এবং ভাষার মাধুর্যে তিনি আজ বিশ্ব রাজনীতিতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অপরদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো সৎ সংসর্গে মেশার সুযোগ পাননি বলেই হয়তো ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি বা পারেন না।

পূর্বে ভারতের সংসদে অর্থাৎ রাজনীতির পীঠস্থানে শাসক ও বিরোধীদের কোনো বিতর্কের সময় কখনই অসংলগ্ন ভাষা প্রয়োগ করে তাঁরা শিষ্টাচার লঙ্ঘন করেননি। তারই একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি। প্রবীন সাংসদ আচার্য কৃপালনী তখন বিরোধী নেতা।, আর তাঁর স্ত্রী শাসক কংগ্রেস বেঞ্চে। প্রবীণ সাংসদ কংগ্রেস সরকারের প্রচণ্ড সমালোচনা করছিলেন। তখন এক কংগ্রেস সদস্য উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠেন, 'আপনার স্ত্রী কিন্তু এখন আমাদের দিকে। মনে রাখবেন, আপনি ওঁকেও আক্রমণ করছেন।' আচার্য কৃপালনী নিজেও দীর্ঘদিন কংগ্রেসে ছিলেন, এমনকী কংগ্রেস সভাপতিও হয়েছিলেন। তিনি হাসতে হাসতে বলে উঠেন; 'এতদিন জানতাম কংগ্রেস সদস্যরা বোকা, এখন দেখছি তারা গ্যাংস্টার। তারা অন্যের বউকে পর্যন্ত উঠিয়ে নিয়ে যায়।' গোটা সংসদে সেদিন হাসির রোল ওঠে। ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়কে মূল্য বৃদ্ধির জন্য সংসদে তাঁর টেবিলের উপরে বিরোধীরা পেঁয়াজ রেখে দিয়ে গিয়েছিল, পঞ্জাবের নিরাপত্তাজনিত ব্যর্থতার জন্য চুড়ি রেখে দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অশালীন ভাষা প্রয়োগ করেননি।

এই কদর্য ভাষা প্রয়োগের সূচনা হয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। সে সময় জ্যোতিবসুর উক্তি ছিল— 'সাঁই মেরেছি বেশ করেছি।' অনিল বসু আরও এক কাঠি উপরে— 'মমতাকে চুলের মুঠি ধরে কালীঘাটে পৌঁছে দেব। মমতা সোনাগাছির মেয়ে। মমতা পেটমোটা উদ্‌বিড়ালের মতো।' ২০১৪ সালে মোদীর উদ্দেশে অধীর রঞ্জন চৌধুরীর বক্তব্য— 'কোন শালা মুসলমানদের এদেশ থেকে বাংলাদেশে পাঠায় আমিও দেখে নেব। আমিও বাংলাদেশ থেকে এসেছি, শালারা আগে আমাকে তাড়াক তারপর যেন মুসলমানদের গায়ে হাত দেয়।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা তো আগেই বলা হয়েছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে— এই সমস্ত গুণীজনদের গর্ভে, ঔরসে, সাহচর্যে শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে গুণবান জন্মগ্রহণ করবে তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে?

সংগঠককে ক্যারিশ্মা সম্পর্কে সচেতন এবং ব্যক্তিপূজা থেকে দূরে থাকতে হবে

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

সংগঠনের সামূহিক ভিত নির্ভর করে কার্যকর্তার নেতৃত্বদানের যোগ্যতার উপর, যেখানে স্ব-পূজন বা ব্যক্তিপূজা নেই, প্রতিভা যেখানে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ও অধ্যাবসায়কে খাটো করে রাখেনি কখনও, কার্যকর্তা যেখানে সদাসক্রিয় এবং প্রত্যুৎপন্নমতি ও জিজ্ঞাসু, সমস্তরকম দীর্ঘসূত্রতা যেখানে সদা পরিত্যাজ্য এবং সময়ের সঙ্গে এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে নিরলস ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সেখানেই সংগঠনের জয়জয়কার। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রঋষি দত্তোপন্ত ঠেংড়ী ‘Beware of Charisma’ শীর্ষক একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা থেকেই প্রস্তুত এই আলোচনা।

নেতৃত্বহীন সংগঠন কোনো কাজ করলে শেষ পর্যন্ত এগোতে পারে না। সামগ্রিক নেতৃত্বের দ্বারাই সংগঠনের ভিত রচিত হয়। এ প্রসঙ্গে ঠেংড়ীজী একটি উদাহরণ দিলেন। ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের প্রথম কৃষক আন্দোলন হয়েছিল গুজরাটে। ৪০-৫০ জনের একটি যুবদল সেখানে সক্রিয় হয়েছিল। সাইকেল-মোটরসাইকেলে চড়ে হাজার হাজার কৃষক জড়ো হলেন, পুলিশ লাঠি চালালো, গোলাগুলি চললো, অনেকে হতাহত হলেন, তার মধ্যে দু’জন মহিলাও ছিলেন। তখন গুজরাটে কংগ্রেসি শাসন, মুখ্যমন্ত্রী অমর সিংহ চৌধুরী (Amar Singh Chowdury as CM from 1985-1989)। সবাই মুখ্যমন্ত্রীকে বললেন, আপনি এদের সঙ্গে কথা বলুন, এদের দাবি কী? মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমি কার সঙ্গে কথা বলবো! আমি কি হাওয়ার সঙ্গে কথা বলবো? এটা তো একটি নেতাবিহীন আন্দোলন।’ শেষে সংগঠনের তরফ থেকে হাসমুখভাই দাবে-কে সংগঠনের তরফে পাঠানো হলো। মুখ্যমন্ত্রী কথা বললেন। অর্থাৎ সংগঠনের জন্য সামগ্রিক নেতৃত্ব প্রয়োজন। এখন নেতা বা কার্যকর্তা কীভাবে কাজ করবেন? তাঁকে প্রতিটি মজদুর বা কৃষককে প্রাধান্য দিতে হবে, তাকে জাগ্রত করতে হবে, তাকে নির্দিষ্ট কাজের জন্য উদ্যত করতে হবে, তাকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে সংগঠনের সুনির্দিষ্ট মতাদর্শে। এটাই সামগ্রিক নেতৃত্বের মূল কাজ।

এখন নেতৃত্ব কতটা বিশ্বাসযোগ্য হবেন? এ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি আমেরিকান সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচক স্টিফেন কোভে-র প্রসঙ্গ আনলেন। কোভে দেখালেন ইংরেজি সাহিত্যের দু’শো বছরের ইতিহাসের প্রথম ১৩০ বছর হলো সাহিত্যে ব্যক্তিচরিত্র নির্মাণ বিষয়ে আলোচনা ও কাহিনির বিস্তার, যাকে বলা হয় Character Ethic. How to become great? সাহিত্যের পরতে পরতে দেখানো হয়েছে সারাজীবন ধরে চেষ্টা করে কীকরে চরিত্রগুলি নিজেরা মহৎ হয়ে উঠেছে। কিন্তু পরবর্তী ৭০ বছরে সাহিত্যে দেখা গেল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠছে Personality Ethic. How to appear great? এই দ্বিতীয় রকমের চরিত্রগুলিতে স্বরূপ নির্মাণের ব্যাপার ছিল, যাকে বলা যায় Image Breeding। তারা গ্রেট কিনা বড়ো ব্যাপার নয়, কিন্তু গ্রেট দেখাতে হবে। এর প্রভাব ভারতবর্ষেও পড়লো,

BHUBANESWAR STATION
BMS
BMS
BMS
BMS
BMS

কারণ সাধারণ ভারতীয় শিক্ষিতরা পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করে। ফলে ভারতীয় সাহিত্যেও এই How to become great —এই চর্চা ও তার স্বরূপ নির্মাণ চললো। এখন ১৯৪৭ সালে, যা ভারতবর্ষে স্বাধীনতা প্রাপ্তির বছর, তার আগে ও পরে ভারতীয় নেতৃত্বের বৈশিষ্ট কী? না, ৪৭-এর আগে হলো How to bnecome great. ৪৭-এর পর হলো How to appear great, ৪৭-এর পরের মানুষের মধ্যে ইমেজ বিল্ডিংয়ের ব্যাপার চলে এল।

এ প্রসঙ্গে আলোচনা করার সময় দত্তোপন্তজী ফিলিপস্ ডোনাল্ড নামে এক মার্কিন প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। ডোনাল্ড সাহেব বলছেন, তদানীন্তন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টনের ক্যারিশ্মা নিষ্প্রভ হয়েছে, কিন্তু কিছুদিন আগেও তো দেখেছি তার বিরাট ক্যারিশ্মা! তার পর্যালোচনা করতে গিয়ে ডোনাল্ড গবেষণাধর্মী কাজ করলেন। খুঁজতে লাগলেন, একজন নেতার কী কী সদর্থক গুণ থাকা উচিত এবং কী কী নঞর্থক গুণ থাকা উচিত নয়। তিনি ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস করতে উদ্যত হলেন। সেখানেও বাধা পেলেন। কারণ ওদেশে যে নেতাকে নিয়ে সবচাইতে বেশি সাহিত্যে আলোচনা হয়েছে, তিনি হলেন আব্রাহাম লিঙ্কন। তিনি যা কিছু বই পেলেন পড়ে ফেললেন। দেখলেন তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে কোনো সাহিত্য কাজ সেখানে নেই। তখন তিনি দেশের সমস্ত সাহিত্য সমালোচক ও পত্রকারদের কাছে চিঠি লিখলেন, জানতে চাইলেন লিঙ্কনের লিডারশিপ কোয়ালিটির উপর কী কী লেখা আছে? কেউ-ই পথ দেখাতে পারলেন না। এইবার তিনি লিঙ্কনের নিজস্ব লেখায় লিডারশিপ নিয়ে কী বলেছেন, কী কী কাজ কীভাবে করেছেন--- সেসব নিয়ে পড়াশোনা ও আলোচনা করতে লাগলেন। তিনি একটি বই লিখলেন ‘Lincoln on Leadership’। সেখানে উল্লেখ রইলো একজন নেতার কী কাজ করা উচিত, কী করা উচিত নয়। সে বইয়ে যা লেখা হলো, তাকে বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে একজন অস্ট্রিয়ান-আমেরিকান ম্যানেজমেন্ট বিশারদ পিটার ড্রাকার Science of Management এবং Practice of Management-এর উপর একটি বই লিখলেন। নাম দিলেন ‘Beware of Charisma’। ড্রাকার সাহেব রিয়ালিটিতে প্রতিষ্ঠা করে গেলেন, একজন নেতা কেমন হওয়া উচিত। দত্তোপন্তজী বলছেন, নেতাকে সবসময় হতে হবে, How to become great। কখনোই তিনি ইমেজ ব্রিডিং করবেন না। বাস্তব থেকে দৃষ্টান্ত নিলেন কয়েকজন নেতার। ইমেজ ব্রিডিং আছে এমন তিন বিশ্বনেতার নাম করলেন, যারা বিগত শতকে বহুশ্রুত, অথচ হারিয়ে গেছেন। তারা হলেন হিটলার, মুসোলিনি ও স্ট্যালিন। এরা স্ফুলিঙ্গের মতন ক্যারিশ্মাতে প্রচণ্ড জ্বলে উঠলেও বেশিদিন স্থায়ী থাকতে পারলেন না। ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে অপরদিক থেকে তিনি আরও দুই বিশ্বনেতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন। প্রথম, জার্মানিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশ চালানোর নেতার অভাব হয়ে পড়লো। তখন কার হাতে দেশের দায়িত্ব দেওয়া হবে? একজন আর্মি অফিসার অ্যাডেনআওয়ার (Konrad Hemann Joseph Adenauer)-এর হাতে পশ্চিম জার্মানির দায়িত্ব (As Chancellor from 15 September 1949 –11 Oct. 1963) দেওয়া হলো। তিনি সেনা অফিসার হিসেবে যথেষ্ট সৎ, দায়িত্ববান ও নিয়মানুবর্তী ছিলেন। কিন্তু রাজনীতিবিদের ক্যারিশ্মা ছিল না, সামাজিক পরিচিতিও ছিল না। অথচ তিনিই সাড়ে তিন বছরের মধ্যে নতুন জার্মানির ভিত তৈরি করলেন। দ্বিতীয়, আমেরিকার দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন। বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন রুজভেল্ট (Franklin D. Roosevelt, 4 March 1933 – 12 April 1945)। আমেরিকার মানুষের দুঃখের শেষ রইল না। সবাই ঠাট্টা-তামাশা করতেন তাঁকে নিয়ে। আমেরিকা জুড়ে চলতি কথা ছিল, ‘ভুল কাজ মহিলারা করে, আর ভুলকাজ করেন ট্রুম্যান’। এই ট্রুম্যানের হাতেই আধুনিক আমেরিকা তৈরি হলো। তিনি কতটা জানেন আর কতটা জানেন না বুঝে নিয়ে, যেটা জানেন না জেনে নিয়ে, পড়াশোনা করে, শিখে দেশ চালাতে লাগলেন। তাঁর ব্যক্তিগত ক্যারিশ্মা ছিল না, কিন্তু How to become great-এর এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠলেন। এইভাবে একজন দলনেতার ব্যক্তিগত স্তাবকতা যে কতটা বর্জনীয়, তা বুঝিয়ে দিলেন দত্তোপন্তজী। প্রসঙ্গের অবতারণা করে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘে ব্যক্তিপুজো বন্ধের ব্যাপারে সরাসরি নিজস্ব মতামত দিয়েছেন তিনি।

হরিদ্বারে BMS-এর প্রথম ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং হলো। সেখানে দুটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। প্রথম, কোনো নেতার নামে জয়ধ্বনি করা হবে না। দ্বিতীয়, BMS-এর কোনো সদস্য বা নেতার জন্মদিন পালন হবে না। এরপর উদয়পুরে BMS-এর এক অধিবেশনে গেলেন তিনি। সেখানকার কার্যকর্তা তাঁকে অত্যন্ত খাতির করলেন। স্টেজে সেই কার্যকর্তার সঙ্গে উপস্থিত হলে হাজার দুয়েক সদস্য তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিলেন। ঠেংড়ীজী বক্তব্য রাখার সময় বললেন, আপনারা আমার জয়ধ্বনি দিচ্ছেন, এতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। কোথাও আমার ব্যক্তি চেতনা খুশি হয়েছে। কিন্তু আমি এটা ভেবে অত্যন্ত দুঃখ পাচ্ছি যে, হরিদ্বার অধিবেশনে কোনো নেতার জয়ধ্বনি হবে না, এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তা সত্ত্বেও এখানে এটা হলো। এরপর সভা শেষ হলে ঠেংড়ীজীকে হোটেলে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে একজন সদস্য তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা সত্যি সত্যিই কি এমন সিদ্ধান্ত হয়েছিল? না-কি আপনি মজা করে এমন কথা বলেছেন! ঠেংড়ীজী উত্তর দিলেন, সিদ্ধান্ত হয়েছে বলেই একথা বলেছি। সেটা নোটিশ আকারে সমস্ত শাখাতেই গেছে। অন্য কোনো শ্রমিক সংগঠনে এই প্রথার প্রচলন থাকলেও BMS কখনই ব্যক্তির নামে জয়ধ্বনি দেওয়ার জায়গা নয়। এরপর তিনি বললেন, অন্য সংগঠনের সঙ্গে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ বা BMS-এর পার্থক্য কোথায়। বললেন, BMS-এর কার্যকর্তারা প্রত্যক্ষভাবে BMS-এর কার্যকর্তা, অপ্রত্যক্ষভাবে ইউনিয়নের কার্যকর্তা। অন্যান্য মজদুর সংগঠনের কাজটা ঠিক এর বিপরীত। অন্যান্য মজদুর সংগঠনের কার্যকর্তারা প্রত্যক্ষভাবে ইউনিয়নের কর্মী এবং অপ্রত্যক্ষভাবে তার নিজস্ব সংগঠনের কর্মী। BMS-এর ক্ষেত্রে এটা একেবারেই উলটো।

যারা অন্য মজদুর সংগঠন থেকে BMS-এ যোগদান করেছেন, তাদের সম্পর্কে ঠেংড়ীজী বলেছেন, তারা শারীরিকভাবে BMS-এর জন্য কাজ করলেও, যতদিন না তারা BMS-এর কর্মসূচি বা কর্মপদ্ধতির সঙ্গে সঠিকভাবে পরিচিত না হবেন এবং মানসিকভাবে মেনে নিতে না পারবেন, ততদিন তাদের সম্পূর্ণ সদস্য বলে ধরে নেওয়া যাবে না। পূর্ববর্তী সংগঠনের মতাদর্শকে বর্জন করে BMS-এর মতাদর্শকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে কাজ করতে হবে, তবেই তারা যথার্থ সদস্য হতে পারবেন। ঠেংড়ীজীর বক্তব্যের মূল কথাটি সব সংগঠনের জন্যই শাশ্বত সত্য। সংগঠন বিকাশের ক্ষেত্রে এবং প্রকৃত সদস্য বিচারে আলোচ্য সংগঠনে কোনো এক ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও দার্শনিকতার সম্পূর্ণ ও অমোচ্য মেলবন্ধন জরুরি। তা ব্যতিরেকে সংগঠন কখনই শক্তিশালী হয় না।

(লেখক কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক)

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের কথা কেউ মনে রাখেনি

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর, মুজিবের শতবার্ষিকী নিয়ে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ হইহই করে অনুষ্ঠান করবে, আর অমর একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে জাতীয় উৎসব পালন করা হবে, যা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এসবের যিনি মূল হোতা, সেই ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত আলোর বৃত্ত থেকে দূরে রয়ে গেছেন। সবাই ভুলে গেছেন ১৯৪৮ সালে ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের সিএপি-তে তাঁর কালজয়ী ভাষণের কথা। ১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ কুমিল্লার বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে সেনা ক্যানটনমেন্টে অকথ্য নির্যাতন করে হত্যা করা হয়, তা কিন্তু এই আলোর উৎসবেও অন্ধকারে থেকে যাবে। অথগু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ববঙ্গের যে একুশ জনেরও বেশি স্বাধীনতা সংগ্রামীর ফাঁসি হয়, তাদের আর বাংলাদেশের সরকার ও মানুষজন মনে রাখে না। শুধু ইতিহাসের করুণ কাহিনি হিসেবে লেখা রয়ে গেছে। ১৯৪১ সালের জনগণায় ২৯ শতাংশেরও অধিক হিন্দু আজ পূর্ববঙ্গে ৮ শতাংশেরও কমে পৌঁছেছে ইসলামিক সম্প্রীতির জোয়ারে। তাই সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের শহিদ দিবস আজ যেমন অপাঙ্‌ক্তেয় রয়ে গেছে, তেমনি ধীরেন্দ্রনাথ দত্তও।

—গৌতম মণ্ডল,
পাঁচবাগা, বাঁকুড়া।

দিল্লিতে অরাজকতার নেপথ্যে

সারা দেশের একশত তিরিশ কোটি মানুষ দেশের রাজধানীতে মুষ্টিমেয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে গণতন্ত্রকে পদদলিত করতে প্রত্যক্ষ করেছেন, তার চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে। আর বিজেপি বিরোধী তাবৎ রাজনৈতিক দল ও নেতা-নেত্রীরা কেন্দ্র সরকার অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদী সরকারকে বলির পাঁঠা করে সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে নির্লজ্জ ভাবে গলাবাজি করে চলছেন। অথচ সবাই জানেন, দেখেছেন কেন্দ্র সরকার বিরোধী সকল দলের তাবড় তাবড় নেতারা কৃষক আন্দোলনকে সর্বপ্রকারে ইন্ধন জুগিয়ে গায়ের ঝাল মেটাতে সলতে পাকিয়েছেন। আর কতিপয় নেতা মেকি কৃষক দরদি সেজে কৃষকদের বিপথে চালিত করেছেন। শেষে এক উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর ক্যাডাররা এই আন্দোলনকে হাইজ্যাক করে লালকেল্লায় জাতীয় পতাকার অবমাননা করে, আইনরক্ষকদের ঘিরে ধরে পিটিয়ে অরাজকতা করেছে। তাদের হাতিয়ার— বড়ো শক্তপোক্ত লাঠি, লোহার রড থেকে তরোয়াল, রক্তাক্ত হয়েছে পুলিশ। লাঞ্ছিত হলো গণতন্ত্র ও আইনের শাসন। এতদ্‌সত্ত্বেও গলাবাজি কমেনি।

রাহুল গান্ধী ভুলে গিয়েছেন যাদের উস্কানি দিয়ে ২৬ জানুয়ারি গণতন্ত্র দিবসের মর্যাদাকে, জাতীয় পতাকার অপমান করাকে ঘৃতাহুতি দিয়ে হিংসার আগুন জ্বালিয়ে দিতে প্রত্যক্ষ সহায়তা করছেন— তাদের হাতেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে নিহত হতে হয়েছিল। উগ্রপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীকে প্রশ্রয় দিলে তা বুমেরাং হয়ে পালটা আঘাত হানতে পারে।

প্রথমে, লোকসভার ভোটে তীব্র পরাজয়, পরে পার্লামেন্টে আইন পাশ করা আটকাতে না পারাতে মনঃকষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। তাতে আইনকে আটকাতে কৃষক আন্দোলনকে ব্যবহার করলেও বিশেষ লাভ হয় না। শুধুমাত্র ক্ষণিক আত্মপ্রসাদ লাভ হতে পারে। এই কৃষক দরদি নেতারা কেউ কৃষিনির্ভর জীবনযাপন করেননি, করবেনও না। তাঁরা পেশাদার রাজনীতিক মাত্র। ২৮টি প্রদেশের মধ্যে মাত্র দুই, তিনটি প্রদেশের কৃষকরা উস্কানিতে আন্দোলনে নেমেছেন। শীঘ্রই তাদের মোহমুক্তি ঘটতে বাধ্য, তারা যেন হেরো রাজনৈতিক নেতাদের দয়ার দৃষ্টিতে পরিণত না হন! কৃষকদের দুর্দশার কারণ ৬ বছরের মোদী সরকার নন, যারা আগে ক্ষমতার মধুভাণ্ড ভোগ করেছেন তারাই— এটা বুঝতে হবে।

কৃষক ও কৃষির কল্যাণে ও উন্নয়নে কেন্দ্র সরকারের বিবিধ পরিকল্পনার সুফল গ্রহণ করলে আখেরে লাভ কৃষকদের। মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস আদৌ তোলা হয়নি, বরং বাড়ানো হয়েছে। পঞ্জাবের কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংহকে ধন্যবাদ। তিনি নিছক রাজনৈতিক বিরোধিতার পথে যাননি। দোষীদের দোষী বলেছেন। নিন্দা করেছেন রাজধানীতে ট্র্যাক্টর চালিয়ে পুলিশকে মেরে ফেলার অপচেষ্টারও। দলীয় মুখপাত্র সুরজেওয়ালার প্রলাপের ১৮০ ডিগ্রি বিপরীতে সঠিক বক্তব্য উপস্থাপন করতে পিছপা হননি। দিল্লির পুলিশ প্রশাসন গুন্ডামি ও পর্দার আড়ালে থাকা কুশীলবদের আবরণ উন্মোচন করে সঠিক ব্যবস্থা নিলেই অরাজকতা সৃষ্টির অপচেষ্টা করতে সাহস পাবে না দেশবিরোধী অশুভ শক্তি ও বিচ্ছিন্নতাবাদীরা।

—বাসুদেব পাল,
শিলিগুড়ি, হাকিমপাড়া।

বামেদের অপকীর্তি কংগ্রেস ভুলে গেল কী করে?

আমি পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে বলছি— প্রদীপ ভট্টাচার্য, আব্দুল মান্নান ও পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী আপনারা খুব সাবধান। যে কমিউনিস্টদের সঙ্গে আপনারা আসন্ন নির্বাচনে জোটে যাচ্ছেন তাদের থেকে সাবধানে থাকুন। এরাই গত ১৯৬৭ ও ৬৮ সালে অজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট করে নির্বাচনে লড়েছিল। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হন কিন্তু তাকে মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনশনে বসতে হয়েছিল। তাঁকে পার্কের মধ্যে অনশন স্থলে পচাডিম ছুঁড়ে, পচা কমলালেবু ছুঁড়ে, কাপড় টানাটানি করে নানাভাবে হেনস্তা করেছিল। সেরূপ ১৯৭৭ সালে প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের সঙ্গে জোট করে নির্বাচনে জয়লাভ করে। পরে প্রফুল্লবাবুকেও নানাভাবে হেনস্থা করে। বামেরা ৩৪ বছর পশ্চিমবঙ্গ শাসন করে। সেই সময় বামফ্রন্টের মন্ত্রী নিরুপম সেনের নেতৃত্বে সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ড হয়।

তাদের রক্তে মাকে ভাত মেখে খাওয়ানো হয়। সেখানে একজন গৃহশিক্ষক খুন হয়ে যায়। সেই সাঁইবাড়ি ঘটনা আপনাদের মনে আছে কি? তাই মনে করিয়ে দিলাম। আপনারা বিদেশি মনোভাবাপন্ন কমিউনিস্টদের চক্করে পড়ে গেলেন। আপনাদের যে কী হবে, ঈশ্বরই জানেন।

শ্রদ্ধেয় অজয়বাবু ও শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লবাবুর মতো দশা আপনাদেরও হবে।

—**লক্ষ্মণ বিষ্ণু,**
সিউড়ী, বীরভূম।

গেরুয়া পোশাকে তৃণমূল কংগ্রেসের গাত্রদাহ কেন?

গেরুয়া রং মোক্ষের রং, সাধুসন্তের রং, মাঙ্গলিক রং, সার্বিক সুখকামনার রং, ঐশী রং। এই রঙের পোশাক পরলে, রঙের মাধুর্যে আমাদের মধ্যেকার দৈবী চেতনা উদ্ভূত হয়। এই রং বিশ্বের কল্যাণের স্বপ্ন দেখার রং, সেবাকর্মের প্রেরণা লাভ করার রং। মনোরম চোখ জুড়ানো এই রং। নববলার্ক যেন আমাদের নয়নমণিকে পরিতৃপ্তি এনে দেয়।

অনেকেই আজকাল এই রঙের পোশাক পড়ছেন বর্ণচ্ছটায় মোহিত হয়ে, কেউ রাষ্ট্রচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, কেউ মুক্তির আলোকপাতে। জামা, পঞ্জাবি, সোয়েটার, স্যুট, শাড়ি, সালোয়ার কামিজের রঙে গেরুয়া এবং তার কাছাকাছি কমলা রং আজকাল প্রাধান্য পাচ্ছে। আর এতেই ভয়ানক চটে উঠছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নানা মাপের নেতা-কর্মী। তারা অনেক বিশিষ্ট মানুষের পোশাকের রঙের দিকে প্রকাশ্যে আঙুল তুলছেন এবং অকথ্য ভাষায় তাদের শাসিয়ে চলেছেন। পোশাকে কে কী রং ব্যবহার করবেন, সেটি তার ব্যক্তি স্বাধীনতা। এই রাজ্যে, ভারতবর্ষে গেরুয়া রং কী নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে? প্রতিবাদ করতে আপনারা সকলে গেরুয়া রঙের পোশাক পরে বলুন, এটা আমার নাগরিক স্বাধীনতা। আমার পোশাকের রং আমি নিজেই ঠিক করবো। দু’ দিনের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা তা ঠিক করে দিতে পারেন না। কোনো দলের গুন্ডা বদমাশ আমাদের শাসাতে পারেন না, গেরুয়া রং ব্যবহার করার জন্য। জয় গেরুয়া-মোক্ষ ভারতবর্ষের জয়। জয় গেরুয়া-দ্যুতি সনাতনী সংস্কৃতির জয়। আমরা আপন সৌকর্যে, আপন নান্দনিকতায় গেরুয়া রঙের পোশাক পরবো এবং পরতে থাকবো।

—**কল্যাণ গৌতম,**
কল্যাণী, নদীয়া।

পুলিশের লাঠির আঘাতে মৃত্যু মইদুল ইসলামকে নিয়ে রাজনীতি

মৃত্যু সর্বদাই বেদনাদায়ক, বিশেষ করে অস্বাভাবিক মৃত্যু, পুলিশের লাঠির আঘাতে মৃত্যু। মাত্র কয়েকদিন আগে ডিওয়াইএফআই-এর নেতৃত্বে নবান্ন অভিযানকে ঘিরে যে উত্তাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তাতে একজন যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। ঘটনাটি অবশ্যই নিন্দনীয় এবং বেদনাদায়ক। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এজন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং মৃতের পরিবারকে সবরকমভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই মৃতুকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের বামছাত্র যুবসমাজ এবং অবশ্যই বাম রাজনীতিকরা ও সংবাদমাধ্যমগুলি। আরও আশ্চর্যের, বিকাশ পাঁজি নামে পাঁশকুড়া থেকে এক যুবনেতাকে নিয়ে ততটা মাথা ঘামাচ্ছেন না কেউ। আমার প্রশ্ন, প্রায় দিনই বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন হয়ে থাকে, তাতে অনেক সময় হিন্দুদের প্রাণহানিও ঘটে থাকে, তখন এইসব বাম যুবনেতা এবং রাজনীতিকরা আশ্চর্যজনক ভাবে নীরব থাকেন। এমনকী তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, পরিবেশবিদ এবং কবি সাহিত্যিকরা মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন। ওইসব ঘটনার কোনো নিন্দা বা প্রতিবাদ শোনা যায় না তাদের মুখে। কিন্তু ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে কোনও মুসলমানের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে (চুরি, ডাকাতি, খুন ইত্যাদির ঘটনা ছাড়া) তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহলে একটা হই হই রব উঠে যায়, গেল গেল রব শোনা যায়। কারণটা দুর্বোধ্য।

—**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার, চন্দননগর।

ধর্ষকের মৃত্যুই একমাত্র শাস্তি

এখনো সময় আছে হিন্দু না জাগলে ভারতবর্ষের উন্নতি সম্ভব নয়। যেদিকেই তাকানো যায় শুধু নারী লাঞ্ছনার ছবি। হিন্দু নারী লাঞ্ছিতা অহিন্দুরা নিঃসন্দেহে লাঞ্ছনাকারী। চোপড়া কাণ্ডে মৃত রাজবংশী সম্প্রদায়ের ১৬ বছরের কন্যা। প্রচণ্ড অত্যাচারের পর তাকে হত্যা করা হয়। কিশোরীকে যেখান থেকে উদ্ধার করা হয় তার একটু নীচে থেকে উদ্ধার হয় ধর্ষকের ক্ষত-বিক্ষত দেহ। তৃণমূলের জয় হিন্দ বাহিনীর ব্লক সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘একটি প্রেমের ঘটনাকে ধর্ষণ বলে চালানো হচ্ছে’। যদি প্রেমেরই হবে তাহলে তার দেহ ক্ষতবিক্ষত হবে কেন? ময়নাতদন্তের পর দেখানো হয়েছে মৃতা কিশোরীর শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই এবং যৌন নির্যাতনের কোনো চিহ্ন নেই। উল্লেখ করা হয়, কিশোরীর মৃত্যু বিষপানে। কিশোরী যদি বিষপানে আত্মহত্যা করবে তবে তার লাশ পুকুর থেকে পাওয়া যাবে কেন? এবিষয়ে বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুলবাবু যে মন্তব্য করেছিলেন সেটা প্রণিধানযোগ্য। উনি বলেছেন সরকার ধর্ষকদের আড়ালে রেখে বাঁচাতে চাইছে। বাম আমলে উত্তরবঙ্গে এক উপজাতি পঞ্চায়েত সদস্যাকে ধর্ষণ করেছিল সিপিএমের একজন অহিন্দু সদস্য। তখনো তাকে আড়াল করা হয়েছিল, তখন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এভাবে যদি ধর্ষককে আড়াল করা হয় তবে প্রকৃত বিচার কবে হবে? ধর্ষক-ধর্ষক, তার কোনো জাত নেই, তার কোনো দল নেই, সে তখন শুধু আসামী, তখন তার মৃত্যুই একমাত্র শাস্তি বলে আমি মনে করি।

—**স্বপন কুমার ভৌমিক,**
শান্তিপুর, নদীয়া।

বন্ধ্যাত্ব ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

বন্ধ্যাত্ব বা ইনফার্টিলিটি আজকের পৃথিবীতে মহিলাদের কাছে একটি অভিশাপেরই নামান্তর। কলকাতার প্রতি তিনজন মহিলার মধ্যে একজন বন্ধ্যাত্বের শিকার। দেখা গেছে এই সমস্ত মহিলা প্রত্যেকেই কোনও না পেশার সঙ্গে যুক্ত। সাধারণভাবে বন্ধ্যাত্বের কারণ হিসেবে থাইরয়েড, পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম, শরীরের ইস্ট্রোজেন কমে যাওয়া—এসবই হতে পারে। পুরুষরাও হতে পারেন বন্ধ্যাত্বের শিকার। তাই সঠিক কারণ নির্ধারণ করে তবেই বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা সম্ভব। শুধু তাই নয়, চিকিৎসার পাশাপাশি সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনও খুব দরকার

বন্ধ্যাত্বের কারণ :

মহিলাদের বন্ধ্যাত্বের বিভিন্ন কারণ হতে পারে। এর মধ্যে কোনো কোনো সমস্যা আবার সামান্য চিকিৎসার মাধ্যমেই সমাধান হয়ে যায়। যে সমস্ত কারণে একজন মহিলা সন্তান ধারণে অক্ষম হয়ে পড়েন তা হলো—

- পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম।
- থাইরয়েড গ্লান্ড ঠিকঠাকভাবে কাজ না করা।
- কোনো অস্ত্রোপচার, এন্ডোমেট্রিওসিস, পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ, ফ্যালোপিয়ান টিউব ব্লক হয়ে যাওয়া।
- ইউটেরাইন ফাইব্রোসিস যা ইউটেরাসে হয়।
- সঠিক বয়সে সন্তান না নেওয়া।
- স্ট্রেস।
- সঠিক পুষ্টির অভাব।
- অতিরিক্ত ওজন।
- ধূমপান ও মদ্যপান।

এই সমস্ত কারণগুলি মধ্যে যে কারণটি সবচেয়ে বেশি তা হলো সঠিক সময়ে সন্তান না হওয়া। চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে ২৫ থেকে ৩২ বছর হলো সন্তান হওয়ার পক্ষে সবচেয়ে সঠিক সময়। সেই মতোই সমস্ত পরিকল্পনা করা উচিত। কিন্তু আজকের কেরিয়ার সচেতন মহিলারা অনেকেই পঁয়ত্রিশের আগে সন্তানের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে পারছেন না। ফলে তাঁদের মধ্যে অনেকে সন্তানসম্ভবা হতে গিয়ে শারীরিক জটিলতার মুখোমুখি হচ্ছেন। দেখা গিয়েছে এই সব মহিলা প্রধানত এন্ডোমেট্রিওসিস ইত্যাদির কারণে ফ্যালোপিয়ান টিউব ব্লক হয়ে যাওয়ার সমস্যায় ভোগেন। মিসকারেজের প্রবল সম্ভাবনাও থেকে যায়। বেশি বয়সে সন্তানের জন্ম দিলে মায়ের নানা শারীরিক জটিলতা তো বাড়বেই, সন্তানের সামগ্রিক স্বাস্থ্যও অনেক সময় যথাযথ থাকে না। বেশি বয়সে সন্তানের জন্ম দিলে শিশুর আন্ডার ওয়েট হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থাকে। এছাড়াও আরও নানান শারীরিক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়।

চিকিৎসা : যে সমস্ত মহিলা অনিয়মিত পিরিয়ড, পিরিয়ডের সময় অত্যধিক ব্যথা অনুভব, পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ, এন্ডোমেট্রিওসিস, থাইরয়েড ইত্যাদি কারণে ভুগছেন তাঁরা অবিলম্বে চিকিৎসকের সাহায্য নিন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করালে সমস্যার অনেকাংশেই সমাধান হয়। এই চিকিৎসার মাধ্যমে শরীরে হরমোনের ভারসাম্য স্বাভাবিক করা হয়। এই চিকিৎসার ফলে যেমন থাইরয়েডের মতো সমস্যার সমাধান হতে পারে, তেমনই টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস, শরীরে ইনসুলিনের মাত্রা কমে যাওয়া ইত্যাদির চিকিৎসাও হয়। তাই বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এন্ডোক্রিনোলজি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম বন্ধ্যাত্বের অপর একটি কারণ। চিকিৎসা নির্ভর করে বয়স, বন্ধ্যাত্বের কারণ, কতদিন ধরে এই সমস্যা চলছে ইত্যাদির উপর। তাই বন্ধ্যাত্ব নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা না করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া একান্তই জরুরি। তবে সময়মতো চিকিৎসা ছাড়াও যে লাইফ স্টাইল মডিফিকেশনও খুব জরুরি। অতিরিক্ত জাঙ্ক ফুড খাওয়ার অভ্যাস, সময়মতো না খাওয়া এবং এর সঙ্গে সঙ্গে ধূমপান ও মদ্যপানের ফলে শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। ওজন বেড়ে যায় অতিরিক্ত। অতিরিক্ত ওজন একজন মহিলার সন্তান ধারণের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা। তাই খাওয়াদাওয়া যেমন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তেমনই উপযুক্ত ব্যায়াম করতে হবে ডাক্তারের পরামর্শমতো। এছাড়াও রয়েছে স্ট্রেস। তাই স্ট্রেসকে যত জীবন থেকে দূরেই সরিয়ে রাখা ভালো। দরকার হলে মেডিটেশনের সাহায্য বা মনোবিদদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এবং অবশ্যই বয়স পঁয়ত্রিশ পেরোনোর আগেই সন্তান নেওয়ার কথা ভাবা উচিত। ❑

অনুপ্রেরণার কেন্দ্র

মীনা ও রীনা

সুতপা বসাক ভড়

মহাপুরুষদের আশীর্বচন থেকে আমরা শিখেছি আমাদের মন চলার পথে সাফল্যের জন্য প্রথমে প্রস্তুত হয়। তারপর শরীর মনকে অনুসরণ করে মাত্র। জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সর্বপ্রথম আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত হই। প্রথমত, লক্ষ্য স্থির করে আমাদের মন। এবার লক্ষ্যপূরণের পথে কীভাবে এগোবে— সেই দিশানির্দেশও দেয় আমাদের মন। লক্ষ্যভেদ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত— কীভাবে, কখন, সবকিছুর জন্যই আমরা প্রথমে মানসিক ভাবে প্রস্তুত হই। মনের চিহ্নিত করা পথে আমরা চালিত হই। সুতরাং, একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, যে-কোনো কাজই হোক না কেন, তার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন মানসিক শক্তি। আমরা যখন মন থেকে আমাদের ‘ধ্যেয়’ স্থির করব, তখন শরীর অবশ্যই মনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সেজন্য আমাদের চারপাশে দেখি যে, মাতৃশক্তি কোনো কাজকে ভয় পেয়ে দূরে ঠেলে দেয়নি, অথবা নিজেরা দূরে সরে আসেনি; বরং মানসিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে শারীরিক বাধাকে উপেক্ষা করে আজ তাঁরা তাঁদের জীবনে সফল এবং অন্যদের অনুপ্রেরণার কেন্দ্র হয়ে উঠেছেন। হরিয়ানার রোহতকের দুই বোনের উদ্যম বর্তমানে ওই অঞ্চলে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাসচালক রূপে কর্মরতা ওই দুটি বোন পুরুষদের তথাকথিত একছত্র কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে সাফল্যের সঙ্গে নিজেদের কাজ করে চলেছে। আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারকে সাহায্য করার জন্য দুই বোন বাস চালানোর সঙ্গে সঙ্গে স্নাতোকোত্তর স্তরে পড়াশুনাও করছে।

রোহতক গ্রামের একতা কলোনি নিবাসী দুই বোন— মীনা হুড্ডা ও রীনা হুড্ডা মহিলা সংস্থা মেক দ্য ফিউচার অব কান্ট্রি-র সঙ্গে যুক্ত ভারী বাহন চালানোর জন্য লাইসেন্স নিয়েছে। বস্তির বাচ্চাদের প্রত্যেকদিন বাসে করে স্কুলে নিয়ে যাওয়া- আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পড়াশুনাও শেখায়। একসঙ্গে দুজনে ইগনু থেকে স্নাতোকোত্তর স্তরে পড়াশুনাও করেছে। ছোটোবেলায় বাবা মারা যান। সেজন্য মা ইন্দ্রাবতীর ওপর সম্পূর্ণ পরিবারের দায়িত্ব এসে পড়ে। ইন্দ্রাবতী দেবী অনেক কষ্ট করে ছেলে-মেয়ে বড়ো করেছেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সেই উপার্জন অনেক কম ছিল। এছাড়া মা চেয়েছিলেন, তাঁর মেয়েরাও যেন অর্থনৈতিক ভাবে স্বাধীন হয়, তাদের যেন কারুর কাছে সাহায্যপ্রার্থী হতে না হয়। এই কঠিন সময়ে ইন্দ্রাবতী দেবী দুই মেয়েকে এমটিএফসি সংস্থাতে ভর্তি করান। এই সিদ্ধান্তের ফলে তাদের জীবন একটি নতুন মোড় নেয়। এখানকার ওই বিদ্যালয়ে পড়াশুনা শেখার সঙ্গে সঙ্গে দুই বোন স্কুটি, বাইক ও গাড়ি চালানো শেখে। সংস্থার সঞ্চালক ও শিক্ষকরা ছোটো বোন মীনাকে উৎসাহ দিলে, সে হরিয়ানা রোড ওয়েজ-এর রোহতক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভারী বাহন চালানোর লাইসেন্সের জন্য আবেদন করে। প্রায় একমাস পরে, সফলতার সঙ্গে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরে ২০১৮-র এপ্রিল লাইসেন্স পায়। বড়ো বাসচালক হিসেবে সে রোহতাকের প্রথম মহিলা। এদিকে বড়ো বোন রীনা বাহাদুরগড় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ভারী বাহন চালাবার জন্য লাইসেন্স পায় এবং সে-ও ভারী বাহন চালানোর মহিলারূপে পরিগণিত হয়।

বর্তমানে রীনা ও মীনার জন্য তাদের মা ইন্দ্রাবতী দেবী গর্বিত। দুই বোন জানায় যে, তাদের দুই ভাই সর্বদা তাদের উৎসাহ দিয়েছে। যখন তারা বাস চালানোর ইচ্ছা জানায়, তখন পরিবার পাশে থাকার জন্য তাদের মনোবল আরও বৃদ্ধি পায়। এই সফলতার জন্য দুই বোন এমটিএফসি-র সঞ্চালক নরেশ ঢল, তসবীর হুড্ডা, মনীষা অগ্রওয়ালকে ধন্যবাদ জানায়।

বাস চালানো শেখার সময় ১০০ জন পুরুষ শিক্ষার্থীর মধ্যে রীনা একা মেয়ে ছিল। কিন্তু নিজের লক্ষ্য স্থির রাখার জন্য সে। আজ সে সফল। সৎ উদ্দেশ্যে একাগ্রচিত্তে এগিয়ে গেলে সফলতা নিশ্চয়ই মিলবে। এর জ্বলন্ত উদাহরণ রোহতাকের দুই বোন মীনা ও রীনা। এই দুই দৃঢ়সংকল্প বোনেদের জন্য রইল আমাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন! □

বিজেপি ক্ষমতায় এলে তৃণমূল হিংসা ছড়াবে

সুকল্প চৌধুরী

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচিত কোনও সরকারই একশো শতাংশ ভোটদাতার সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসে না। এখনও পর্যন্ত কোনও গণতান্ত্রিক দেশে বা রাজ্যে ভোটদানে এই ধরনের প্রতিফলন দেখা যায়নি। এমনকী লেনিন, মাও, স্ট্যালিন, কিম, শি জিনপিংয়ের দেশে সকলের কণ্ঠরোধ থাকলেও মনের ভেতর বিরোধিতা আছেই। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর প্রবল জনপ্রিয়তা নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী সংসদে এসেছিলেন। আবার ইন্দিরাকে হত্যার পর আবেগে ভর করে রাজীব গান্ধী দেশের ইতিহাসে প্রথমবার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসেন। তবুও দেশের সব ভোটদাতা কংগ্রেসকে সমর্থন করেনি। পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিবর্তনের ফলে ১৯৭৭ সালে বামেরা এবং ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল সমর্থন পেলেও সবাই তাদের ভোট দেয়নি। বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার রীতিই তাই। এরই নিরিখে বলা যায় এই রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি একক গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এলেও সবাই পদ্ম চিহ্নে ভোট নাও দিতে পারেন।

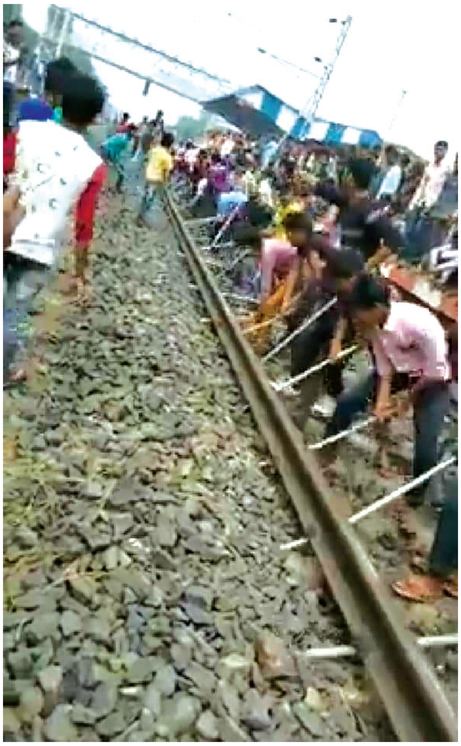

সিএএ-র বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গজুড়ে এভাবেই রেললাইন উপড়ে দেওয়া, রেলে আগুন দেওয়া, সম্পত্তি নষ্ট করার তাণ্ডব চলে কয়েকদিন। রাজ্য সরকার সব দেখেশুনেও নীরব।

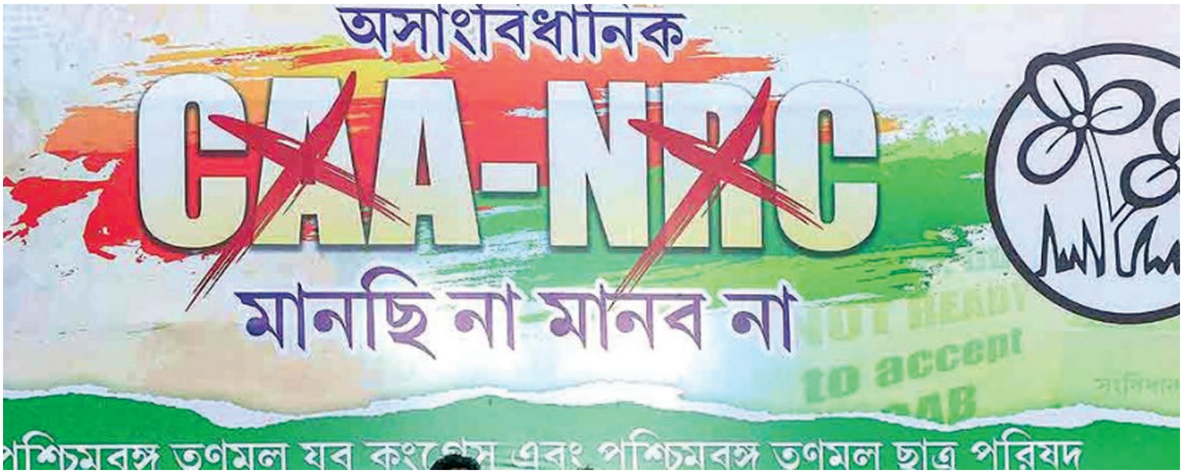
অসাংবিধানিক
CAA-NRC
মানছি না মানব না
NOT READY to accept CAB
পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল যুব কংগ্রেস এবং পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল ছাত্র পরিষদ

এই রাজ্যের ভোটদাতারা ১৯৬৯, ১৯৭৭ ও ২০১১ সালে প্রাতিষ্ঠানিক বিরোধিতা করে সরকার পরিবর্তন করেছেন। বিভিন্ন মানুষের ভেতর রাজনৈতিক মতাদর্শগত মতভেদ থাকলেও সেইসব সরকারকে গণতান্ত্রিক প্রথা হিসেবে সবাই মেনে নিয়েছেন। দেখা গিয়েছে সরকার বদলের পর রাজনৈতিক বিরোধিতা বা সরকার বিরোধী কর্মসূচি থাকলেও প্রতিপক্ষ বদলা নিতে পথে নেমে ভয়াবহ প্রতিশোধ বা হিংসা ছড়ায়নি। এমনকী রাজনীতির সঙ্গে ধর্মীয় মেরুকরণের কথাও কোনও রাজনৈতিক দল ভাবেনি। বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জনস্বার্থে নবান্নে যাবে। কিন্তু প্রথমদিন থেকেই প্রধানত তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন ধরনের হিংসাত্মক বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হবে বিজেপিকে। এই বিশেষজ্ঞদের মতে তৃণমূলের বিরোধিতার অন্যতম বিষয় হবে কট্টর ধর্মান্ধতার রাজনীতিকরণ। মনে করা হচ্ছে বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে প্রথম এবং প্রধান সমস্যা হবে মমতা ব্যানার্জির দলের এই ধরনের উগ্র ও সাম্প্রদায়িক আচরণ। রাজনৈতিক বিরোধিতা ও জন-আন্দোলনের নামে প্রতিনিয়ত হিংসা ছড়ানো হবে। এই হিংসায় পরিষ্কার ধর্মীয় ইন্ধন থাকবে। সংসদে নাগরিকত্ব বিল পাশ হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেখেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মদতে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সংগঠিত ভাবে এবং পরিকল্পনা করে গাড়িতে আগুন দেওয়া, রেলের কামরা জ্বালানো, লাইন উপড়ে ফেলা-সহ বিভিন্ন ধরনের জেহাদি সন্ত্রাস ছড়ানো হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছিল। যদিও মমতা ব্যানার্জি এই ঘটনাকে সামান্য বিষয় বলে মন্তব্য করেছিলেন। এই রাজ্যে বিজেপি বিভিন্ন ধরনের

উন্নয়নমুখী প্রকল্প হাতে নেবে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলির সঙ্গে যেসব প্রকল্পের যেসব প্রকল্পের সমন্বয় থাকবে। তৃণমূল কংগ্রেস চাইবে রাজ্যে পথে নেমে প্রতিনিয়ত হিংসা ছড়িয়ে ও সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করে ভয়ের আবহ তৈরি করতে। যাতে সরকার জনমুখী প্রকল্পগুলি সুচারু ভাবে রূপায়িত করতে না পারে।

সকলেই জানেন, মমতা ব্যানার্জির রাজনৈতিক ভোটব্যাঙ্ক হলো ইসলামি কট্টরপন্থী মৌলবাদীরা। তাদের সঙ্গে আছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গারা। মূলত শিক্ষা-চেতনার অভাব, পুরনো ধ্যানধারণা থেকে সরতে না চাওয়া, জীবনযাপনের প্রতিটি পদক্ষেপকে হাদিসের (কুরআন নয়) সঙ্গে যুক্ত করার জন্য অন্ধকারে রয়েছে মুসলমান সমাজ। যদিও তাদের ভেতর অনেকেরই শিক্ষার উন্মেষ ঘটেছে। কিন্তু এই সংখ্যা এতই কম যে মৌলবাদীদের সঙ্গে তারা পেরে উঠছে না। মুসলমানদের স্থায়ী কর্মসংস্থানের পরিবর্তে কিছু তাৎক্ষণিক উপঢৌকন ছেটানো, স্কলারশিপের নামে সরকারি টাকা বিতরণ, খুন ধর্ষণ ডাকাতির মতো অপরাধ করলেও চোখ বুজে থাকা, অনুপ্রবেশে উৎসাহ দেওয়া--- রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় জেহাদিদের ঘাঁটি বানাতে দেওয়া— এই সবই হলো বাম ও তৃণমূল কংগ্রেসের মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক সুরক্ষিত করার মাধ্যম।

যতদিন মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় আছেন ততদিন মুসলমানরা যত খুশি অপরাধ করতে পারে এমন একটা ধারণা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দিকে দিকে সন্ত্রাসবাদী তৈরির কারখানা হিসেবে খারিজি মাদ্রাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। এত টাকার উৎস কোথায় তাই নিয়ে বর্তমান রাজ্য সরকারের কোনও প্রশ্ন নেই। এমনই পরিস্থিতিতে ভারতের মঙ্গল কামনাকারী একমাত্র দল বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে উগ্র মৌলবাদী মুসলমান, অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গারা প্রবল চাপের মুখে পড়বে। গণতন্ত্রপ্রেমী, প্রকৃত ভারতীয়রা সংগঠিত হলে তোষণকারী মমতা ব্যানার্জির তথাকথিত ভোটব্যাঙ্ক নিশ্চিত ভাবে ছত্রভঙ্গ হবে। হাজারো প্রশাসনিক মোকাবিলা করতে হবে তাদের। রাজ্যবাসীকে অনেক হিসাবও দিতে হবে দেড় জনের মালিকানায় থাকা দলের শীর্ষ দু'জনকে এবং তাদের অনুগতদের। এই অনুগতদের ভেতর অনেকেই আবার কলকাতা ও রাজ্যের কোনো কোনও অংশকে পাকিস্তান বলে ভাবতে ভালোবাসেন।

মমতা ব্যানার্জি এই বিষয়গুলি অবশ্যই জানেন ও বোঝেন। তাই সরকার পরিবর্তন হলে লুম্পেনদের অস্ত্রহাতে মাঠে নামার প্রস্তুতিও নিয়ে রেখেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এমনটিই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। ফলে বিজেপি ক্ষমতায় এলে প্রশাসনিক ভাবে তো বটেই রাজনৈতিক ভাবেও তৃণমূল কংগ্রেসকে মোকাবিলা করতে হবে। রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা বিজেপিকে প্রতিনিয়ত সমস্যায় রাখতে চাইবে বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসের জেহাদি শক্তি।

এখানে আরও একটি বিষয় এসে যায়। মুসলমানদের ভেতর অনেক গোষ্ঠী, অনেক ধর্মীয় সংগঠন আছে। যারা সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে পথে নামে না। কিন্তু গোয়েন্দাদের দেওয়া তথ্য অনুসারে তারা মমতা ব্যানার্জির প্রশ্রয়ে ও আশ্রয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। সরকার পরিবর্তন হলে মুসলমানদের এইসব গোষ্ঠী বা জেহাদি শক্তি তাদের 'কাজকর্ম' চালিয়ে যেতে পারবে না। ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সামান্য ইশারাতেই অস্ত্র হাতে পথে নামতে চাইবে তারা। বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের ডাক তারা আগেই দিয়েছে। ইতিমধ্যেই বসিরহাট, উলুবেড়িয়া, কালিয়াচকে নিজেদের শক্তি যাচাই করেছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী বসিরহাটে অস্ত্র হাতে নামা তৃণমূল আশ্রিত জেহাদি গুন্ডাদের দমন করতে গিয়ে রাজ্য পুলিশের উপর মহলের কর্তারা নিজেরাই আক্রান্ত হয়েছিলেন। পরে এই কর্তারা মুসলমান গুন্ডাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই লুম্পেনদের কথা মতো কান ধরে উঠবোস করে রেহাই পান তাঁরা। এই পুলিশ কর্তাদের অনেককেই পদোন্নতি করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তবে আশার কথা, এই গুন্ডাদের কঠোর ভাবে শায়েস্তা করার ক্ষমতা বিজেপি সরকারের থাকবে।

চলতি মাসের ১১ তারিখ বাম-কংগ্রেসের যুব ও ছাত্রদের নবান্ন অভিযানে পুলিশকে যে ভাবে প্রতিরোধ করা হয়েছে তাতে উৎসাহিত ষাটোর্ধ্ব বাম নেতারা। ইতিহাসে স্থান করে নেওয়া বামেদের তরুণ ব্রিগেড এদিন কলকাতার রাজপথে যে ভাবে প্রতিরোধ করেছে তাতে তৃণমূলও উল্লসিত। কারণ হরিশ মুখার্জি স্ট্রিটের ধারণা ভবিষ্যতে মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল ও বামেরা যদি এক হয়ে তাণ্ডব করতে মাঠে নামে তবে রাজ্যকে আরও অগ্নিগর্ভ করা যাবে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, সেক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেস নিজের পতাকা বা ব্যানার নেবে না। পরিবর্তে পরিকল্পিত ভাবে জেহাদি শক্তিকে এগিয়ে দেবে। একটা সময় কংগ্রেস ও বামেদের ভোটব্যাঙ্ক ছিল মুসলমানরা। এবারে নিজেদের ও মমতা ব্যানার্জির অস্তিত্ব রক্ষায় তারাও লাল জার্সির আড়ালে লুকোতে পারে।

এই রাজ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশ ছাড়াও সামান্য কিছু মানুষ বামেদের সমর্থক। গণতান্ত্রিক বহুদলীয় ব্যবস্থায় যা কিনা খুবই স্বাভাবিক বিষয়। আশাই করা যায় তারা কখনই বিজেপিকে সমর্থন জানাবে না। মতাদর্শগত কারণে এই বিরোধিতা স্বাগত। কিন্তু বামেরা তাদের অভ্যাস ও স্বভাব অনুসারে কোনও গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়াই সরকারকে ব্যাতিব্যস্ত রাখতে এবং জনগণকে সমস্যায় ফেলতে ঘনঘন ধর্মঘট ডাকতে পারে। বিজেপি কখনই তৃণমূল কংগ্রেসের মতো স্বৈরাচারী শাসক নয়। সহনশীলতা অনেক বেশি। বিজেপি সরকারকে দুর্বল ভাবতে পারে বাম-কংগ্রেস এবং তৃণমূলি জেহাদিরা। তবে রাজ্যবাসী বোঝেন অস্থিরতা কীভাবে দমন করতে হয় তা বিজেপি পরিচালিত প্রশাসন জানে। বামেদের এই 'ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও' নীতি এবং কথায় কথায় বনধ ডাকা, এইসব পিছিয়ে পড়া রাজনৈতিক কর্মসূচি অনেকটাই বাড়বে বলে মনে করেন বুদ্ধিজীবী মহলের একটি অংশ। ভ্রান্ত এই রাজনৈতিক সমস্যা উন্নয়নের কাজে বাধা তৈরি করতে পারে।

মমতা ব্যানার্জি ভোট সুরক্ষিত রাখতে জাতপাতের রাজনীতি করেছেন। তিনি

তামাং, গুরুং, লেপচা, মেচ, রাভা, নমঃশূদ্র, রাজবংশী-সহ এখনও পর্যন্ত মোট ৬৭টি জাতিগোষ্ঠীর উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করেছেন। বলা হয়েছে জনগোষ্ঠীগুলির কৃষ্টি-কলা-ঐতিহ্য রক্ষার জন্য পর্ষদগুলি কাজ করবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই উন্নয়ন পর্ষদগুলির কাজ কী কেউ জানে না। এইসব পর্ষদের সদস্যরা অতীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থক হলেও বর্তমানে ঘাসফুলের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন। প্রতিটি পর্ষদের কার্যকরী পরিচালন সমিতির সাধারণ সদস্য সংখ্যা কত নিজেরাও জানেন না। আবার পর্ষদগুলির এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য সংখ্যা ও তাদের পদের নাম কী তা সরকারও জানে কিনা সন্দেহ। যদিও তাঁদের অনেকেই সরকারি গাড়ি ও ভাতা পান। পর্ষদগুলিও কাজ করার জন্য নিয়মিত সরকারি টাকা পাচ্ছে। তবে খরচের হিসাব কেউ চায় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরকারি দেয় টাকার কোনও অডিটও হয় না। এই উন্নয়ন পর্ষদগুলির সদস্যরা মাঝে মাঝে বৈঠক করে অনেক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন আর মমতা ব্যানার্জির গুণগান করে বিবৃতি দেন— এটাই তাঁদের কাজ। সরকার পরিবর্তন হলে অবশ্যই এসব পর্ষদের কাজ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে 'গৌরী সেনের' টাকার বরাদ্দে কোপ পড়তে বাধ্য। স্বার্থে ঘা লাগলে সুবিধাভোগী পর্ষদ কর্তারা ক্ষুব্ধ হবেন। সেই সুযোগে তৃণমূল নেতৃত্ব এইসব পর্ষদের সদস্যদের উসকে দিয়ে অহিষ্ণুতার বার্তা ছড়াতে পারে। তৃণমূল কংগ্রেসের এই রাজনৈতিক পরিকল্পনারও ছক করা আছে।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা, যে ভাবেই হোক ক্ষমতা ধরে রাখতে হায়নার পিঠে সাওয়ার হয়েছেন মমতা ব্যানার্জি। এই হায়না ভয়ানক। শরীর বাঁকিয়ে সাওয়ারির পা ধরে টেনে নামাতে ওস্তাদ। অতীতে রাজা জয়চাঁদ এবং সাম্প্রতিক সময়ে জওহরলাল নেহরু— লোভী হিংস্র হায়না কাউকে ছাড়েনি। ইতিহাস দেখিয়েছে মহম্মদ ঘোরি প্রথমে পৃথ্বীরাজকে মারেনি। 'বন্ধু' জয়চাঁদকে মেরেছে। একইভাবে নেহরুবন্ধু জিন্না প্রথমেই শত সহস্র হিন্দুকে হত্যা করে দেশভাগ করেছিল। 'বন্ধুত্বের' ভয়াবহ দাম কিন্তু দিতে হয় সাধারণ মানুষকে।

অনেকেরই আশঙ্কা, বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে এমনই রক্তস্নাত রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি করাতে পারে বাম ও তৃণমূল কংগ্রেস। এই দলের হিংসা ছড়ানোর মূল হাতিয়ার হবে তাদের ২৭ শতাংশ বিশেষ ভোটব্যাঙ্ক। বলা হয়, হাতিয়ার হত্যা করলেও খুনের জন্য দায়ী নয় অস্ত্র। কিন্তু এখানে হাতিয়ার নিজেই হত্যাকারী। ফলে হাত ও হাতিয়ার সমান দায়ী। রাজনৈতিক ভাবে ভোট মোকাবিলা করতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনে পরাস্ত হলে বিজেপি সরকারকে রাজনৈতিক ভাবে নাজেহাল করতে গিয়ে ময়দানে 'হাতিয়ার' ছেড়ে দিলে অবস্থা ভয়াবহ হবে। পালা বদলের সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু করবে এমন বোধবুদ্ধিহীন মমতা ব্যানার্জি নন। তবে নিশ্চিত ভাবে অচিরেই তিনি রাজনৈতিক কার্যকলাপের ভেতর দিয়ে পরিকল্পিত ভাবে অশান্তি শুরু করবেন। সেই অশান্তি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ নিতে পারে। মানুষকে দেখাতে চাইবেন বিজেপি সরকার কতটা ব্যর্থ। তবে আশঙ্কা, অশান্তি শুরু হলে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কোনও ভাবেই তাঁর হাতে থাকবে না। তার বাহন হায়নারা বড়ো ভয়াবহ। তারা নিজেই নিজের নিয়ন্ত্রক হবে। রক্ত তাদের বড়ো প্রিয়। □

রাজ্যের মানুষের জীবনে আনন্দ ও সচ্ছলতার পরিবেশ ফিরিয়ে দিতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

অগ্নিমিত্রা পল

পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরে সামাজিক, আঞ্চলিক ও অর্থনৈতিক বিবিধতা রয়েছে। সরকার গঠন করার পরে আমাদের সেই বিবিধতাকে সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি সমান্তরাল সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে আনতে হবে। কৃষি ও শিল্পায়ন দুটোকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে। এই কাজ আমাদের সব রাজনৈতিক বাধা অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্বার্থে সফল করতেই হবে। কর্ম সংস্কৃতি ও শিক্ষিত সমাজের সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমে যুব সমাজকে সঠিক পথে ফেরাতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্পায়ন, সংস্কৃতি জগৎ এবং সমাজের সব স্তরে অযথা রাজনীতিকরণের যে প্রবণতা বর্তমানে প্রকটরূপ নিয়েছে, তার থেকে রাজ্যকে মুক্ত করতে না পারলে কোনোভাবেই কোনো প্রকার গঠনমূলক কাজ করা সম্ভব নয়। এই রাজ্যের নারীদের দিনের পর দিন যেভাবে শোষণের মাধ্যমে অবিচারের শিকার হতে হচ্ছে, তা দূর করতে সঠিক আইনি পরিকাঠামো গড়ে তোলা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে যেভাবে কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে, সেই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত করে মানুষকে সবরকম সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি কর্মীকে ও সরকারকে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হবে। কোনোরকম অজুহাত বা মিথ্যে প্রহসন নয়, খাতায়-কলমে মানুষের জন্য কাজ করে দেখাতে হবে আমাদের। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ গত চার দশক ধরে উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত। তাদের জীবনে আনন্দ ও স্বচ্ছলতার পরিবেশ ফিরিয়ে দিতে ভারতীয় জনতাপার্টি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

(লেখিকা রাজ্য বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী)

পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন পরবর্তী সরকারের এক বৃহৎ চ্যালেঞ্জ

ড. রতন কুমার ঘোষাল

পশ্চিমবঙ্গে ভোটের বাদ্যি বাজলে শুধু ভারতেই নয় সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে একটা আলোড়ন তথা কৌতূহলের সৃষ্টি হয় এবং নানা ধরনের অশনি সংকেতও পাওয়া যায়। ভোট যে পশ্চিমবঙ্গের দরজায় কড়া নাড়ছে তা পশ্চিমবঙ্গে দৈনিক নানা ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক হিংসা- প্রতিহিংসা মূলক কার্যকলাপের মধ্যেই অভিব্যক্ত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ভারতের অন্য যে কোনো রাজ্যে ভোটপর্ব প্রায় নীরবে বা কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও দুর্ঘটনা ব্যতিরেকেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে গত ৪৪ বছরের ভোটপর্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য সকলেরই চোখে পড়বে। যেমন ভোটের আগে কিছু নেতা, মন্ত্রী, রাজনৈতিক কর্মী খুন হওয়া, ছোটো-বড়ো নির্বিশেষে অকথা-কুকথায় অবতীর্ণ হওয়া, মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে কমবয়সি ছোটো নেতাদেরও বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা-মন্ত্রীদের 'তুই' সম্বোধন করা ইত্যাদি। তা সত্ত্বেও বলা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে নাকি সুষ্ঠ গণতন্ত্র বিরাজমান। এ ব্যাপারে তথাকথিত সংস্কৃতিবান বুদ্ধিজীবীদের প্রায়ই বলতে শোনা যায় 'বাঙ্গলার মানুষ নাকি অতিমাত্রায় রাজনীতি সচেতন'। এগুলি তারই অভিব্যক্তি। এই সামাজিক-রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করেই শাসকদলের পোষ্য বুদ্ধিজীবীদের, নেতা মন্ত্রীদের ও বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদেরও বলতে শোনা যাচ্ছে— বিজেপি অবাঙ্গালি-অসংস্কৃতির বহিরাগত দল। অথচ পশ্চিমবঙ্গে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, জেপি নাড্ডা, অমিত শাহ বক্তৃতা দিতে গিয়ে বিরোধীদের প্রতি কোনো কুকথা প্রয়োগ করেননি। আসলে শাসকদলের পোষ্য, নেতা-মন্ত্রীরা ও অন্যান্যরা ভুলে গেছেন যে তৃণমূল, সিপিএম প্রভৃতি দলগুলি এক একটি আঞ্চলিক দল। অন্যদিকে বিজেপি, কংগ্রেস এরা জাতীয় দল। স্বভাবত ভোটই হোক বা অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড জাতীয়স্তরের নেতা-মন্ত্রীদের এই রাজ্যে সমাগম হতেই পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে যে কোনো কেন্দ্রীয় নেতা-মন্ত্রী যে কোনো সময়ে যে কোনো রাজ্যে আসতেই পারেন।

এ তো গেল পশ্চিমবঙ্গের ভোটপর্ব শুরু হওয়ার সামান্য পূর্বের চিত্র। গত ৪০ বছরে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার চিত্র দেখলে পশ্চিমবঙ্গের দৈন্যদশা কতখানি সেটা বোঝা যাবে। পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসনও একেবারেই ভেঙে পড়েছে। স্বভাবতই দেখা যাচ্ছে আগামী নির্বাচনে যে সরকার ক্ষমতায় আসবে তার কাছে প্রথম এবং প্রধান চ্যালেঞ্জই হবে রাজ্যে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা।

এখন রাজ্যের সামাজিক ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা, উন্নয়নের বহর, বেকারত্ব প্রভৃতির সামান্য পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ সরকারের সম্মুখে কত বড়ো চ্যালেঞ্জ অপেক্ষমান। বোঝা যাবে পশ্চিমবঙ্গের ম্লান মুখকে উজ্জ্বলতর করতে হলে কী কী আশু কর্তব্য।

রাজ্যে শিল্প নেই,

পশ্চিমবঙ্গ যে ধীরে ধীরে শিল্পবিহীন হয়ে পড়েছে তা একটা সামান্য তথ্য থেকে বোঝা যায়। ৬০-এর দশকের প্রথম দিকে সারা ভারতের শিল্প উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প উৎপাদনের অবদান বা অংশ ছিল প্রায় ৩৬ শতাংশ। বর্তমানে তা ৫ থেকে ৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরের শাসনকাল থেকেই ধীরে ধীরে অতিবামপন্থী শ্রমিক আন্দোলনের ফলে ও কর্মসংস্কৃতি ধ্বংসের ফলে একের পর এক শিল্প বন্ধ হয়ে যায়। বাম শাসনের শেষের দিকে বৃহৎ শিল্পপুঁজি আনার চেষ্টা হলেও তা সম্পূর্ণ বিফলতায় পরিণত হয়। শিল্প স্থাপনের নামে সাধারণ মানুষ নিধন, জমি নিধন হয় ও রাজনৈতিক হানাহানি হয়। অনেক এমওভি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও বাস্তবে বিনিয়োগ হয়নি। নতুন শিল্পও গড়ে উঠেনি। বাম সরকারের আমলে ক্ষুদ্র, কুটির ও কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশের কথাও তেমন ভাবা হয়নি। যা পশ্চিমবঙ্গের মতো অদক্ষ শ্রমিক প্রধান রাজ্যের ক্ষেত্রে খুবই প্রযোজ্য ছিল। বর্তমান তৃণমূল সরকারের আমলেও মুখ্যমন্ত্রী প্রতিবছর বিশ্ববাংলা সম্মেলন করেও কোনো নতুন শিল্প আনতে পারেননি। বরং সম্মেলনের নামে রাজ্যের সম্পদ ধ্বংস হয়েছে। আসলে চালকরা ভুলে গেছেন যে বড়ো বড়ো শিল্পপতি ও বহুজাতিক শিল্পসংস্থাগুলি কষ্টি পাথরে বিচার করে তবেই বিনিয়োগ করেন। এরা তো লাভের জন্য দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুতরাং যেখানে উপযুক্ত পরিকাঠামো, উপযুক্ত দক্ষ শ্রমিক, উপযুক্ত বাজার, উপযুক্ত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, শিল্পবন্ধের সরকারি নীতি ও ঝুঁকি কম থাকবে সেখানেই বিনিয়োগ করবে। তাছাড়াও বর্তমানে বিশেষত বিশ্বায়নের যুগে যেখানে physical capital-এর চেয়ে intangible capital-এর অর্থাৎ knowledge based technology, information technology, digital process, softwore techonology- র প্রাধান্য বেশি— যার ফলস্বরূপ পৃথিবীর এক দেশে মূলধনি দ্রব্য তৈরি হচ্ছে অন্যদেশ তাদের সংযোজন হচ্ছে, আর একটা দেশে প্যাকিং হচ্ছে আবার অন্য আর একটা দেশ থেকে পরিপূর্ণ দ্রব্য বাজারজাত করা হচ্ছে— এই ধরনের শিল্প উৎপাদন পদ্ধতিই বিশ্বব্যাপী চলছে। সুতরাং বর্তমানে বিপুল সংখ্যায় ভারী শিল্প হবে ও শিল্পের উন্নতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান হবে ও রাজ্যের প্রভূত উন্নতি হবে— এ আশা বোধ হয় খুব একটা বাঞ্ছনীয় নয়। বরং পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক আকারে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, এমএসএমই কৃষিভিত্তিক শিল্প, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রভৃতি স্থাপনের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব হবে। এর

শিক্ষাক্ষেত্র

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রের অবস্থা নানাভাবে পর্যালোচিত হয়েছে। শিক্ষা-সংস্কৃতি যে তলানিতে চলে গেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষাক্ষেত্রে কলেজে কলেজে ছাত্র ভর্তি নিয়ে দুর্নীতি, তোলাবাজি সর্বজন বিদিত। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষক, প্রশাসক ও অশিক্ষক কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি দিনের পর দিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে অযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ শিক্ষাক্ষেত্রে একটা অঘোষিত নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইউজিসি-র নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শাসকগোষ্ঠীর তাঁবেদার কলেজ অধ্যক্ষদের DPI (Edu)-দের অবলীলাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে ক্রমাগত নিয়োগ করছে। অথচ কলেজের অধ্যক্ষরা প্রফেসর নন। ইউজিসি-র নিয়ম অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হতে গেলে যে কোনো

চাকরি নেই, বেকারত্বের হাহাকার

পাশাপাশি কিছু বড়ো শিল্প স্থাপন করতে হবে। এটিও নবাগত সরকারের কাছে একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ!

বেকারত্ব শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সারা ভারতবর্ষের একটা অন্যতম প্রধান সমস্যা । বেকারত্বের সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবসা ও উৎপাদন কাঠামোর একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। ২০07 সালের পর থেকে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার কারণে পৃথিবীর সব দেশেই উৎপাদন, আমদানি-রপ্তানি, কর্মসংস্থান প্রভৃতির উপর বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাব পড়েছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে ভারতে সংগঠিত ক্ষেত্রে শিল্প ও সরকারি ক্ষেত্র মোট কর্মসংস্থানের শ্রমযোগ্য মানুষের মাত্র ৯ শতাংশ নিয়োগ করে। বাকি ৯১ শতাংশ শ্রমযোগ্য মানুষ অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োজিত। পশ্চিমবঙ্গেও এর ব্যতিক্রম নয়। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকার ও অদক্ষ শ্রমিকদের যাদের কারিগরি শিক্ষার অভাব, বেকারত্ব যে কত তীব্র তা গত বছরেও এ পর্যন্ত কোভিড মহামারী পরিস্থিতি থেকে অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে গেছে। রাজ্য থেকে এত বিপুল পরিমাণ পরিযায়ী শ্রমিক অন্য রাজ্যে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাচনের জন্য গিয়েছিল তা আমাদের ধারণার বাইরে ছিল। এছাড়া সাধারণ শিক্ষিত, কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত অসংখ্য বেকার যুবক কর্ম প্রাপ্তির আশায় রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে অথবা বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। ফলত, পশ্চিমবঙ্গ যে ধীরে ধীরে বৃদ্ধাশ্রমে পরিণত হচ্ছে তা সংবাদমাধ্যম ও বিভিন্ন বৃদ্ধাশ্রমের বিজ্ঞাপন থেকেও পরিষ্কার।

অবিলম্বে রাজ্যের শিক্ষক - এর শূণ্যপদে যোগ্যতার ভিত্তিতে স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগ চাই।
ভবিষ্যৎ যদি হয় দোকান গড়া তবে কেন ট্রেনিং করা।
অপমৃত্যু

জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ২০১৮-১৯ সালের তথ্য অনুযায়ী দেখা গেছে, পশ্চিমবঙ্গে পুরুষ শ্রমিকদের ৮১ শতাংশ ও মহিলাদের ২২.২ শতাংশ কাজে নিয়েজিত। স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে ৫১.৬ শতাংশ কর্মক্ষম শ্রমিক কাজে যোগ দেয়। এদের মধ্যে ৪৩.৮ শতাংশ স্বনিযুক্ত অর্থাৎ কৃষিতে ছোটোখাটো ব্যবসাতে, বিভিন্ন এজেন্সি হিসেবে কাজ করে। ২১.৯ শতাংশ দৈনিক নিয়মিত মজুরিতে বা বেতনভোগী হিসেবে কাজ করে। এছাড়া প্রায় ৩০ শতাংশ নৈমিত্তিক শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। এখন যদি পশ্চিমবঙ্গের শ্রমোপযোগী মানুষের অনুপাত দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে ২০১৮-১৯ সালে মোট পুরুষ জনসংখ্যার ৭৭.৭ শতাংশ, মহিলা জনসংখ্যার ২১.৭ শতাংশ ও পুরুষ-মহিলা মিলিয়ে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশ শ্রমযোগ্য (অর্থাৎ এদের বয়স ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে)। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে মোট ১০ কোটি জনসংখ্যা হলে উপরিউক্ত অনুপাতগুলি থেকে বেকারত্বের ভয়াবহতা সহজেই বিচার করা যায়। গত বছরের ভয়াবহ কোভিড মহামারিতে শুধু এরাজ্যই নয় সারা ভারতেই এই সমস্ত স্বনিযুক্ত, নৈমিত্তিক ভাবে নিযুক্ত মানুষজনের বিপুল পরিমাণে কর্মহীনতার ফলে দুখঃদুর্দশার চিত্র আমরা দেখেছি। ধীরে ধীরে লকডাউন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়াতে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা গেলেও, রাজ্যে বেকারত্বের পরিমাণ এখনও সাধারণ ভাবেই ভয়াবহ। সুতরাং নবাগত সরকারের কাজে তীব্র বেকারত্বের (শিক্ষিত ও অশিক্ষিত) সমাধান করা এক বিশাল চ্যালেঞ্জ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যূনতম পাঁচ থেকে দশ বছর প্রফেসর পদে থাকতে হবে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের বিখ্যাত জার্নালে তাঁর যথেষ্ট সংখ্যক উচ্চমানের গবেষণাপত্র প্রকাশিত থাকতে হবে, দেশে বিদেশে বিভিন্ন আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, শিক্ষাক্ষেত্রেও বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম থাকতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েই এই নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে উপাচার্য নিয়োগ হচ্ছে। বামফ্রন্টের আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে 'অনিলায়ন পদ্ধতি' অতিমাত্রায় সক্রিয় ছিল। দীর্ঘদিন বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত থেকে দেখেছি বাম আমলে মাত্র দুজন এ ধরনের ব্যক্তিকে উপাচার্য পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে একজন পিএইচডি উপাধি ভাঁড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ নিয়েছিলেন ও পরে উপাচার্য হয়েছিলেন। অনেক টিভি চ্যানেলে অনেক সময়ই তাঁকে দেখি ভাষাতত্ত্ববিদ ও শিক্ষাবিদ হিসেবে। সরকারি বিভিন্ন পদেও তাঁকে দেখা যায়। এত ঘৃণ্য অপরাধ সত্ত্বেও সমাজের সামনে তাঁরা আসেন কী করে তা ভাবতেও অবাক লাগে! মাত্র একজন ছিলেন যাঁকে কলেজের অধ্যক্ষ থেকে সরাসরি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু তৃণমূলের আমলে একেবারে দল থেকেই তুলে এনে সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাথায় উপাচার্য পদে নিয়োগ করা হচ্ছে। রাজ্যে এমন বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে যেখানে প্রফেসর নন, Reader Post-এ থাকা ব্যক্তিকেও কিছুদিন আগে অস্থায়ী উপাচার্য করা হয়েছিল, অথচ সেখানে প্রফেসর পদে থাকা অনেক ব্যক্তিই ছিলেন। এই সমস্ত ব্যাপারে রাজ্যপাল বাধা দিলেই, তাঁকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। স্কুল সার্ভিস কমিশন, টেট পরীক্ষার দুর্নীতি সর্বজনবিদিত। অশিক্ষক কর্মী নিয়োগের দুর্নীতিও বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং নবাগত সরকারের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাঠামোয় আমূল সংস্কার সাধন করা ও কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন শিক্ষানীতির প্রকৃত রূপায়ণ করা যাতে মানুষ তৈরির কারিগর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মানব সম্পদ তৈরি করতে পারে।

কৃষিক্ষেত্র

একথা বহু চর্চিত যে পশ্চিমবঙ্গের ৬৭ শতাংশ পরিবার গ্রামে বসবাস করে, তাদের মধ্যে ৪৫ শতাংশ হলো কৃষি পরিবার। এদের অধিকাংশেরই আয়ের প্রধান উৎস হলো কৃষিকার্য। কৃষিতে কার্যকর জোতের বণ্টনে দেখা যায় প্রায় ৮৩ শতাংশই হলো প্রান্তিক চাষি ও ১৩ শতাংশ হলো ক্ষুদ্র চাষি। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে চিরাচরিত সমস্যা অর্থাৎ ঋণের অভাব, মহাজনি কারবার, ফসলের উপযুক্ত দাম না পাওয়া, কৃষি পরিকাঠামো না থাকা, উপযুক্ত বাজার ব্যবস্থার অভাব প্রভৃতি এখনও প্রকট। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের বিকল্প হিসেবে কৃষিভিত্তিক ছোটো ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পূর্ণ অভাবও ভীষণ ভাবে প্রকট। যার জন্য গ্রাম থেকে বহু কৃষি শ্রমিক, অদক্ষ শ্রমিক, কম শিক্ষিত কৃষি পরিবারের সদস্যরা পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে অন্যরাজ্যে জীবিকার সন্ধানে চেলে যায়। চাষবাস থেকে লাভ চাষে অত্যধিক খরচ, উপাদানের অত্যধিক দাম, ফসলের অনিশ্চয়তা, ফসলের উপযুক্ত দামের অভাব, বাজারের অভাব প্রভৃতি কারণে একেবারে তলানিতে পৌঁছে যাওয়ায় রাজ্যের প্রায় ৪২ শতাংশ কৃষক চাষবাস ছেড়ে, জমি ঠিকা পদ্ধতিতে দিয়ে অন্য পেশায় যেতে চাইছে। এ তথ্য জাতীয় নমুনা সমীক্ষাতে আছে। ভারতের নতুন কৃষি আইন পশ্চিমবঙ্গে (যেখানে প্রান্তিক ও অতি ক্ষুদ্র চাষির প্রাধান্যই বেশি) কৃষকদের আত্মনির্ভরতা অর্জনে যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আমার মনে হয়। সুতরাং নবাগত সরকারের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে নতুন কৃষি আইন কার্যকর করা, প্রভূত পরিমাণ স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা ও গ্রামাঞ্চলের কৃষি সমবায়, কৃষি বাজার সমবায়, কৃষিজাত দ্রব্যের প্রক্রিয়াকরণ সমবায়, বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী, বিভিন্ন স্বনির্ভর মহিলা গোষ্ঠী স্থাপনের মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কৃষি বহির্ভূত ক্ষেত্রে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাও একটা বৃহৎ চ্যালেঞ্জ।

উন্নয়ন ও অর্থনীতির অবস্থা

বর্তমান সরকারের গত ৯-১০ বছরে উন্নয়ন যতটা না হয়েছে, তার তুলনায় উন্নয়নের নামে ডোল রাজনীতির কারণে সম্পদের নিধন যজ্ঞ হয়েছে বেশি। অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ উন্নয়ন মানে রাজ্যের ক্ষেত্রে State Domestic Product অর্থাৎ রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত করা ও রাজ্যের কাঠামোগত পরিবর্তন (সামাজিক, অর্থনৈতিক, সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থার পরিবর্তন তথা উন্নতি) করা। এই দুটির কোনোটাই হয়নি। আসলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোনো মেকানিক্যাল পদ্ধতি নয়। এটা নিভর করে মানবিক উদ্যোগ, দক্ষতা ও উৎসাহ বা যারা এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত তাদের মোটিভেশনের উপর। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গে রিয়েল সেক্টর ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ প্রকৃত ক্ষেত্র ভিত্তিক উন্নয়ন একেবারেই হয়নি। সবকিছুর পাশে একটা করে 'শ্রী' যোগ করলেই রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, সবুজসাথী, ক্লাবকে অনুদান এ ধরনের অনেক প্রকল্পের মাধ্যমে তোষণ তথা প্রকৃত উন্নয়নের বিফলতা ঢাকা দেওয়ার নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ বা সম্পদের অনুৎপাদনশীল ব্যবহার করা হয়ে চলেছে তা এ সরকার থাকলে হতেও থাকবে। অথচ এই পরিমাণ অর্থ দ্বারা রাজ্যে দু-চারটে সাইকেল তৈরির কারখানা, মোটরবাইক তৈরির কারখানা, কৃষিভিত্তিক ছোটো ও কুটির শিল্প তৈরি করে ফেলা যেত। তাতে বিপুল পরিমাণে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতো, রাজ্যের এসডিপি অনেক বাড়তো, রাজ্যের আয়ও বাড়ত, অনেক অনুসারি শিল্পও তৈরি হতো এবং রাজ্যের সম্পদ অন্য রাজ্যে যেত না। রাজ্যের মধ্যে এগুলির চাহিদাও প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। সুতরাং রাজ্যের মধ্যেই এদের জোগান, চাহিদা ও আয় একটা গুণক পদ্ধতিতে বাড়তেই থাকত এবং প্রকৃত উন্নয়নও হতো। ঋণ ও ফিসক্যাল ঘাটতির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে যদি তার উৎপাদনশীল ব্যবহার করা হয় তাহলে তার থেকে শুধু কর্মসংস্থানই হয় না, গুণক পদ্ধতিতে মানুষের আয়, ভোগ ও সরকারের আয় বাড়তে থাকে। তার ফলে ঋণও শোধ হয়। কিন্তু ঋণ করে বা জনগণের টাকায় শুধুমাত্র দানছত্র করে তোষণ করলে প্রকৃত উন্নয়ন হয় না। বরং রাজ্য ক্রমাগত ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে যা পশ্চিমবঙ্গে অতি মাত্রায় ঘটছে। বাজেট পেপারে এগুলিকে সোশ্যাল সার্ভিস হিসেবে দেখানো হচ্ছে। এখানে

উল্লেখ্য, ২০১৮-১৯ সালেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মোট প্রকৃত পুঞ্জীভূত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার ৩০০ কোটি টাকাতে। ওই সালে ঋণ নেওয়া হয়েছে মোট ৪৫,১৯১.৩৬ কোটি টাকা। যদি এই হারে ঋণের বহর বেড়ে থাকে (তা অবশ্যই হয়, কারণ ভোটের আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দানছত্রের পরিমাণ অনেক বাড়িয়েছে) তাহলে ২০২০-২১ সালে এই ঋণ দাঁড়াবে ৯০, ৩৮২.৭২ কোটি টাকায়। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৫,২৮,৮৭৪.০৮ কোটি টাকায়। ২০১৮-১৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঋণ শোধের পরিমাণ ছিল ২০,৭৮১.৪৪ কোটি টাকা। যদি এই পরিমাণেই প্রতিবছর শোধ করা হয় তাহলে এ পর্যন্ত ৬২, ৩৪৪.৩২ কোটি টাকা ঋণ শোধ করা হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ ৪,৬৬,৫২৯.৭৬ কোটি টাকা। মনে রাখতে হবে, এর সিংহভাগই বাজার থেকে ঋণ নেওয়া। অতএব নবাগত সরকারের কাছে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক দুর্দশার মোকাবিলা করে বেকারত্ব দূরীকরণ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প প্রভৃতির উন্নতিসাধন করা সত্যসত্যই একটা বিশালাকার চ্যালেঞ্জ।

সার্বিকভাবে একথা বলা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন নির্বাচনের পর নবাগত সরকারের কাছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিই মৌলিক চ্যালেঞ্জ : (১) সর্বক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ/পরিকাঠামো ফিরিয়ে আনা, (২) বেকারত্ব দূরীকরণ, (৩) প্রতিটি ক্ষেত্রে (সরকারি বেসরকারি) মানুষের বিশ্বাস অর্জন করা, (৪) শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমূল প্রশাসনিক সংস্কার করা, (৫) কৃষি আইন ও নতুন শিক্ষানীতির বাস্তব রূপায়ণ করা, (৬) সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন করা (৭) সিএএ, এনআরসি কার্যকর করা ও পরিশেষে ফিসক্যাল সংস্কার করা।, তবে এর জন্য প্রয়োজন সরকারে দক্ষ, সৎ উদ্যমী ও রাজ্যের তৃণমূল স্তর পর্যন্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলির সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের প্রাধান্য। কারণ রাজ্যের সম্পদ দেশমাতৃকার সম্পদ। এই সম্পদের অপব্যবহার মানে ঈশ্বরপ্রদত্ত সম্পদের অপব্যবহার। তাই দেশ তথা মানুষের সেবার মাধ্যমে ও ত্যাগের ব্রত নিয়ে কাজ করতে হবে। তাহলেই আবার সোনার বাঙ্গলার গৌরব ফিরে আসবে।

(লেখক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং প্রাক্তন অধ্যাপক)

CENTRALIZED OPD COMPUTERIZED TICKET COUNTER

স্বাস্থ্যক্ষেত্র

পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অপ্রতুলতা সর্বজনবিদিত। বামফ্রন্টের আমল থেকেই দেখা যাচ্ছে এরাজ্য থেকে বহু মানুষ উপযুক্ত ও সঠিক চিকিৎসা পাওয়ার আশায় দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন হসপিটালে যেমন ভেলোরের খ্রিস্টান মেডিক্যাল কলেজে, চেন্নাইয়ে অ্যাপেলো হসপিটালে এখনও ভিড় করে চলেছে। আমি ২০১৩ সালে ভেলোরে সিএমসি-র ডাইরেক্টরের সঙ্গে কথা বলে জেনেছিলাম যে ওদের দৈনিক ৪০০০ রোগীর মধ্যে ২৪ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসেন। অনেক প্রাইভেট হসপিটাল ও নার্সিংহোম (যেমন শ্রমজীবী হসপিটালগুলি) করোনা চিকিৎসার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে, তাদের খরচ বাবদ প্রভূত পরিমাণ টাকা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে এখনও পায়নি। রাজ্যে কয়েকটি সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল হলেও সেগুলিতে সুপার স্পেশাল চিকিৎসারও সুযোগ নেই এবং পাশাপাশি কোনো অত্যাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামও নেই। সুতরাং উপযুক্ত স্বাস্থ্য কাঠামো গড়ে তোলা ও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলগুলিতে অধিক পরিমাণে আধুনিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার মাধ্যমে বঙ্গবাসীর স্বাস্থ্যসুরক্ষার ব্যবস্থা করাও নবাগত সরকারের কাছে একটা বড়োরকমের চ্যালেঞ্জ। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার নিজের অক্ষমতা ঢাকতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত 'আয়ুষ্মান যোজনার সুযোগ থেকে রাজ্যবাসীকে বঞ্চিত করেছেন। এর পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক কারণ।

মালদহে বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরে মাতৃ-পিতৃপূজন উৎসব

কল্পনা করুন আপনার সন্তান পিতা-মাতা হিসেবে আপনাকে ও আপনার স্ত্রীকে গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছে, মাথায় ছিটিয়ে দিচ্ছে ফুলের পাপড়ি, চন্দনের টিপ পরিয়ে দিচ্ছে কপালে। তারপর হাঁটু গেড়ে আপনাদের দুজনের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করছে। আপনি ও আপনার স্ত্রী ধান-দূর্বা-প্রদীপ-চন্দনে সাজানো বরণডালা নিয়ে সন্তানের সেই শ্রদ্ধাকে সম্মান জানাচ্ছেন। আলিঙ্গন করছেন আনন্দাশ্রু ঝরিয়ে। চলছে মাতৃপূজার গান, পিতৃপূজার মন্ত্র। চলছে ভারতীয় নৃত্য আর যোগাসন প্রদর্শন।

মাতৃ-পিতৃ পূজন উৎসব
বিবেকানন্দ শিশু / বিদ্যা মন্দির
বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গ কর্তৃক অনুমোদিত
বাচামারী গভঃ কলোনী, মালদহ
মাতৃদেবো ভব
পিতৃদেবো ভব

এমনই এক বিরল ঘটনার উপস্থাপনা হলো মালদহের বাচামারী গভঃ কলোনি স্থিত বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরের ভাই-বোনদের পিতৃ-মাতৃ পূজন দিবসে স্থানীয় তরুণ সঙ্ঘের ময়দানে। শিশু মন্দিরের বারোশো বাবা-মা ও তাঁদের সন্তানেরা পূজার থালা সাজিয়ে যখন পূজা করছে এবং পূজা শেষ তাঁদের শিশুরা প্রণাম করছে, বাবা-মাকে আলিঙ্গন করছে, তখন মনে হচ্ছিল যেন চতুর্দিক থেকে ওঙ্কাধ্বনির রব উঠছিল আর আকাশ থেকে হচ্ছিল পুষ্পবৃষ্টি। উপস্থিত ছশোরও বেশি দর্শক বলছিলেন— এখনো পারিবারিক বন্ধন শেষ হয়ে যাযনি, স্নেহ-ভালোবাসা- সম্মান হারিয়ে যায়নি। ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পরম্পরা আজও অটুট। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব কেড়ে নিতে পারেনি ভারতীয় সংস্কৃতির বহমান ধারাকে। বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরের প্রধানাচার্য পঙ্কজ কুমার সরকার জানালেন, সাড়ে আটশো ছাত্র-ছাত্রীর এই বিদ্যালয় গত তিন বছর ধরে মাতৃ-পিতৃ পূজন উৎসব পালন করে আসছে। তার ফলে শুধু সীমিত পরিবারগুলিই উপকৃত হচ্ছে না, সামগ্রিক ভাবে সমাজভাবনাও সমৃদ্ধ হচ্ছে। স্বাধীন সাহা সহ শিশু মন্দিরের আচার্য-আচার্যা ও সেবক-সেবিকারা অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা, কলকাতা থেকে আগত বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা লেখক সুজিত রায়, মালদহ শোভানগর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ড. হরিস্বামী দাস, পুরাতন মালদা পৌরসভার পৌরপ্রশাসক কার্তিক ঘোষ। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পিনাকী রায়। অনুষ্ঠানে দুজন মা শ্রীমতী বীণাপাণি পাল (পুত্র অধ্যাপক) ও শ্রীমতী রঞ্জা বিশ্বাসকে (পুত্র ডাক্তার) সংবর্ধনা দেওয়া হয়, যাঁরা অতি দারিদ্র্যের মধ্যেও উপযুক্ত ভাবে পুত্রকে মানুষ করেছেন। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানের প্রশংসা করে বলেন, রাজ্যের সমস্ত স্কুলে এরকম অনুষ্ঠান হওয়া উচিত।

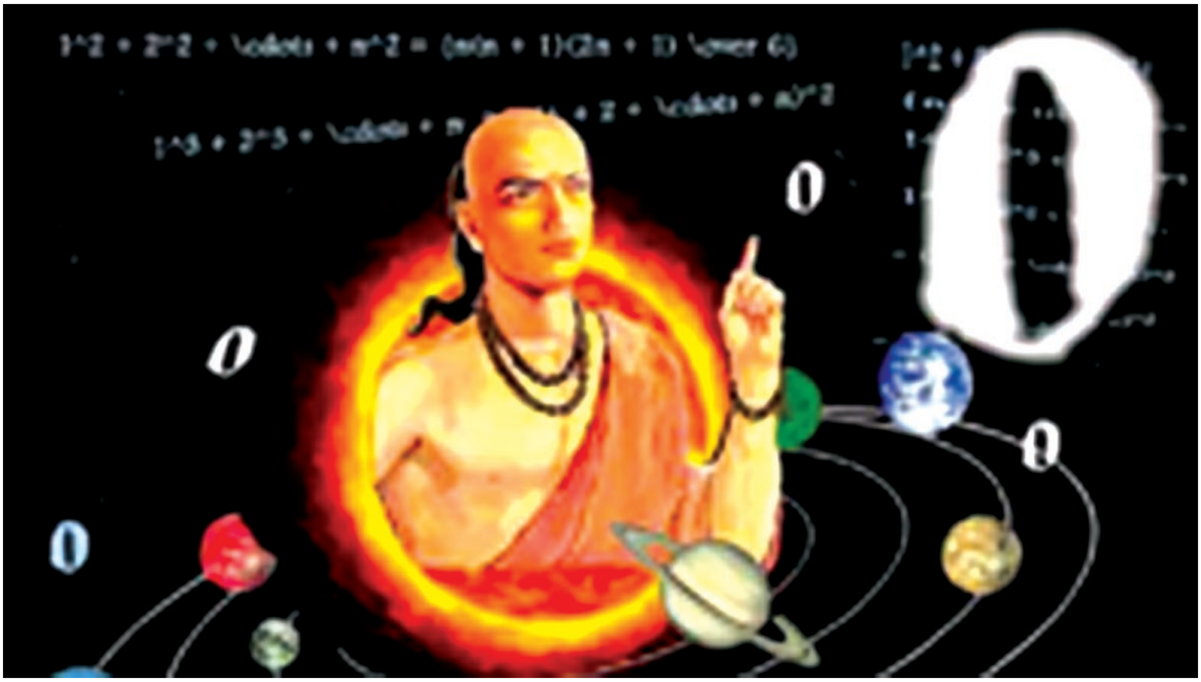

সভ্যতার বিকাশে ভারতের অবদান

বীরেন্দ্রনাথ শুকুল

জীবনের প্রকাশ হলো তার ধারাবাহিকতায়। এর একপ্রান্তে জন্ম ও বৃদ্ধি, অপর প্রান্তে জরা ও মৃত্যু। মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে প্রাপ্ত বয়স্কতা। সুতরাং জরা ও বার্ধক্য কোনো স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া নয়, এ হলো জীবনের প্রবহমানতারই পরিণতি। কিন্তু অবশ্যম্ভাবী এই বার্ধক্যের বিলম্ব ঘটানো কি সম্ভব? বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মধুসূদন কানুনগো বার্ধক্যের কার্যকারণ সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেছেন। তার গবেষণা ক্ষেত্রটি জীবন বিজ্ঞানে Molecular Biology of Ageing নামে পরিচিত।

রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন— 'প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে। প্রথম সামরব তব তপোবনে। প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে। জ্ঞান ধর্ম কত কাব্য কাহিনি।' বিজ্ঞানে যখন এত অগ্রগতি হয়নি, প্রচারমাধ্যম এত সক্রিয় ছিল না, ভারতের মেধা তখনও মানব সভ্যতার বিকাশে নানা উপাদান ও মৌলিক চিন্তাধারায় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিল। আদি শঙ্করাচার্য বলেছেন, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্ম বলতে বোঝায় শক্তি, যার অস্তিত্ব আছে কিন্তু অবয়ব নেই। আইনস্টাইন বললেন— পদার্থ ও শক্তি একই ($E=mc^2$)। সভ্যতার বিকাশে ভারতের অবদানগুলি অনুধাবন যোগ্য।

সংখ্যার আবিষ্কার : খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে সংখ্যার ব্যবহার দেখা যায়। এই জ্ঞান আরবদের মাধ্যমে ইউরোপে এবং পাশ্চাত্যে পৌঁছায়। আরবদেশে এই সংখ্যাগুলিকে 'হিন্দসে' বলা হয়। অর্থাৎ হিন্দুস্থান থেকে আমদানি। ফরাসি গণিতজ্ঞ 'লাপ্লাস' নেপোলিয়নের রাজত্বকালে বলেছেন— ভারত সংখ্যাতত্ত্বের জ্ঞান আমাদের দিয়েছে। ব্রহ্মগুপ্ত অঙ্কে প্রথম শূন্যের ব্যবহার করে দেখান। দশ সংখ্যার সাহায্যে সমস্ত সংখ্যাকে প্রকাশ করা যায়— এই নতুন তথ্য ভারতের আবিষ্কার।

পাটিগণিতের আবিষ্কার : এর ব্যবহার শুরু হয় দ্বিতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দে। ভাস্করাচার্যের লেখা লীলাবতী বইকেই প্রথম আধুনিক পাটিগণিতের বই হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিয়ার মতে ৪৯৯ এডি-তে আর্যরা তার বই পাটিগণিতের নিয়ম শেষ করেন। পাটিগণিতের জ্ঞান আরবদের মাধ্যমে পাশ্চাত্যে পৌঁছায়।

বীজগণিতের আবিষ্কার : পশ্চিম ইউরোপ অ্যালজেবরার জ্ঞান গ্রিকদের থেকে শেখে নাই, ভারত থেকে নিয়েছে। বীজগণিতের আরবীয় নাম অ্যালজেবরা। আর্যভট্ট এমন এক ব্যক্তিদের মধ্যে একজন যিনি অ্যালজেবরা ব্যবহার করেন (এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা)।

লোহা আবিষ্কার : আয়াস (৩০০০

বিসি) শব্দটি চার বেদেই উল্লেখ করা আছে, যার অর্থ লোহা। অশোক স্তম্ভ, নিউ দিল্লি ও কর্ণাটকে লৌহস্তম্ভ ভারতীয় ধাতু বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার নিদর্শন।

অভিকর্ষ আবিষ্কার : সিদ্ধান্ত শিরোমণি বইতে ভাস্করাচার্য পৃথিবীর আকর্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন— যা কয়েক শতাব্দীর পর নিউটন অবিষ্কার করেছেন।

রাসায়নিক পদ্ধতি আবিষ্কার : রং ও রাসায়নিক রং রসায়ন বিদ্যাকে ভারতে রসায়ন শাস্ত্র বলা হয়। এলফিনস্টোন History of India বইতে লিখেছেন তারা (ভারতীয়) কপার ও জিংক সালফেট তৈরি করতে জানতো, লোহা ও সিসার কার্বনেট তৈরি জানতো। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে অ্যালকেমি সম্পর্কে ভারতীয়রা জানতো।

দশমিক পদ্ধতি আবিষ্কার : জার্মান লেখক Dr Thomas Arya লিখেছেন, যে ওজন পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো (2500 BC) তা Binary system এবং পরিমাপ পদ্ধতিতে দশমিক এবং ব্যবহার হতো। গণিতজ্ঞ ‘ল্যাপ্লাস’ বলেছেন— হিন্দুদের নিকট আমাদের অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, যারা দশমিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন।

ডিজিটাল পদ্ধতি আবিষ্কার : ডিজিটাল পদ্ধতি যা রাশিবিজ্ঞানকে প্রভাবিত করেছেন তা ভারতের অবদান। চীনারা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে, ভারতের এই পদ্ধতিকে পরে আরবীয়দের মাধ্যমে পাশ্চাত্যে পৌঁছায়।

পৃথিবীতে প্রথম ওষুধের সাংকেতিকীকরণ (Codify) : আয়ুর্বেদ সর্বপ্রথম মানব জাতিকে ওষুধের সাংকেতিকীকরণ উপহার দেয়। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে চরককে ওষুধের জনক বলা হয়। এখন আয়ুর্বেদ পৃথিবীতে তার উপযুক্ত স্থান পেতে চলেছে।

শল্য চিকিৎসা প্রচলন : ভারতে প্লাস্টিক সার্জারি বর্তমানে প্রচলিত প্লাস্টিক সার্জারির জনক বলা হয়। ‘লিমকা বুক অব রেকর্ড’-এর মতে শুশ্রুত হচ্ছে প্রথম একজন, যিনি চতুর্থ শতকে প্রথম প্লাস্টিক সার্জারি করেন।

প্রাচীনতম লেখা : Science Reporter 1999-এর মত অনুযায়ী হরপ্পায় মাটির নীচে পাওয়া লিপিই হচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীনতম লিপি।

সংস্কৃত হচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীন ভাষা : এই ভাষা ৬৩টি অক্ষর এবং উচ্চারণ নিয়ে গঠিত। যেখানে রুশ ভাষায় ৩৫টি, স্পেনীয় ভাষায় ৩৫টি পার্শিতে ৩১টি ইংরেজিতে ২৬টি ল্যাটিন ও হিব্রুতে ২০টি অক্ষর আছে।

পৃথিবীতে প্রথম যন্ত্রনির্ভর শহরের পত্তন : খনন কার্যের ফলে পাওয়া হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোতে বাড়ি ও শহরের মধ্যে আছে পরিকল্পনার কলাকৌশল। এখানে স্টেডিয়াম এবং জল সরবরাহ ও নিকাশি ব্যবস্থা লক্ষণীয়।

বছরের দিন সংখ্যা : পঞ্চম শতকে ভাস্করাচার্য বলেন পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ৩৬৫.২৫৮৭৫৬৪৮৪ দিনে। এর প্রায় একশো বছর পরে পাশ্চাত্যের জ্যোতির্বিদগণ প্রদক্ষিণ কাল নির্ণয় করেন।

পাই (η) এর মান নির্ণয় : বোধায়ন পাই-এর মান বের করেন। তিনি পিথাগোরাসের থিয়োরি বলতে যা বোঝায়, তার ধারণা অনেক আগেই বের করেন।

দ্বিঘাত সমীকরণ বা কোয়াড্রেটিক ইকোয়েশন : একাদশ শতাব্দীতে শ্রীধর আচার্য দ্বিঘাত সমীকরণ আবিষ্কার করেন। গ্রিক ও রোমানদের কাছে সংখ্যার সর্বোচ্চ মান ১০৬ পর্যন্ত যেখানে হিন্দুরা ১০ এর গায়ে ৫৩টি শূন্য দিয়ে গঠিত সংখ্যা এবং সংখ্যাগুলির প্রতিটির নাম জানত। বৌদিক যুগে ৫০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই ধরনের পারদর্শিতা ছিল ভারতীয় গণিতজ্ঞদের। এমনকী এখন সর্বোচ্চ ১০ এর পরে ১২টি শূন্য গঠিত সংখ্যাই সর্বোচ্চ সংখ্যা।

জ্যোতির্বিদ্যা আবিষ্কার : আর্যভট্ট আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে জানতেন। ব্রহ্মদেব লতাদেব সূর্যসিদ্ধান্ত বইতে পৃথিবীর অক্ষ সম্বন্ধে বলেছেন এবং এই অক্ষকে সুমেগু বলেছেন। বরাহমিহির বলেছেন যে, পৃথিবী একটি গোলক যা অক্ষের চারদিকে ঘুরছে। অন্যান্য অনেক ভারতীয় জ্যোতির্বিদ কোপার্নিকাশের আগেই একথা জানিয়েছেন (এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা)।

ক্যালেন্ডর আবিষ্কার : সময়ের পরিমাপ আবিষ্কার, দিনের পরিমাপ, মাস, বছরের হিসাব আবিষ্কার— সূর্যসিদ্ধান্ত বইতে লতাদেব (৫০৫এডি) বছরকে ১২ মাসে ভাগ করেন। সৌরমণ্ডলের সাতটি গ্রহ পৃথিবীর জলবায়ুকে প্রভাবিত করে। সেই হিসাবে ৭ দিনকে নামকরণ করা হয়েছে— যা সারা পৃথিবী মান্যতা দিয়েছে।

ভারতের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ হলো তার উন্নত মেধার কোটি কোটি মানুষ আর বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ। সরকারি সদিচ্ছার অভাবে ভারতের উন্নত মেধা উন্নত দেশগুলিতে চলে যাচ্ছে। উন্নত দেশগুলিতে প্রতি বছর যেসব কৃতী মানুষ পুরস্কৃত হন তাদের একটি বড়ো অংশ ভারতীয় বংশোদ্ভূত। সুখের বিষয়, ২০২০-২১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের জন্য স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে ৬৩০২ কোটি টাকা।

তথ্যসূত্র :

১. চেনা পৃথীবীর অজানা কথা--- ভট্টাচার্য, ঘোষ, দাস।

২. ভারতীয়করণকে বিরোধী— দীননাথ বত্রা।

৩. বর্তমান পত্রিকা।

লোকসংস্কৃতি ও ইতিহাসের মেলবন্ধনে পুদিচ্চেরীর মানাকুল্লা বিনয়গড় মন্দির

কৌশিক রায়

সুপ্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যবাহক হিসেবে পুদিচ্চেরীর একটি দেবস্থানের নাম উল্লেখ করতেই হয়। লোকসংস্কৃতি এবং ইতিহাসের মেলবন্ধনযুক্ত সেই মন্দিরটি হলো মানাকুল্লা বিনয়গড় মন্দির।

তামিল ভাষাতে 'মানস'-এর অর্থ হলো 'মন' বা 'আত্মা'। আর 'কুল্লাম' শব্দটির অর্থ হলো 'পুকুর' বা 'পুষ্করিণী'। এই মন্দিরে এলে ইষ্টদেবতার আরাধনার মধ্যে দিয়ে পুষ্করিণীর গভীর, নিস্তরঙ্গ জলের মতোই মনের শান্তি পাওয়া যাবে— সেই আশাই করেন এই মন্দিরে আগত পুণ্যার্থীরা। এই মন্দিরের অন্যতম পূজ্যদেবতা সিদ্ধিদাতা গণেশ বা 'বিনায়ক' থেকেই 'বিনয়গড়' শব্দটি এসেছে। আবার, পূর্বতন পুদিচ্চেরীতে বালিয়াড়ি ঘেরা অনেক পুকুর ছিল। তামিল ভাষাতে 'মানাল' বলে বালিকে। সেই সময়ে মন্দির তৈরি হওয়ার আগে একটি পুকুরের ধারে বালিয়াড়ির কাছে সিদ্ধি বিনায়কের মূর্তি বসিয়ে স্থানীয় গ্রামবাসীরা পূজা করতেন। সেখান থেকেও এই 'মানাকুল্লা বিনয়গড়' মন্দিরটির নামকরণ হতে পারে। পুদিচ্চেরীর ফরাসি নাগরিক অধ্যুষিত অঞ্চলে এটিই একমাত্র হিন্দু মন্দির। কথিত আছে, বহুদিন আগে এক নিষ্ঠুর, প্রভাবশালী ও ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ব্যক্তি এই মন্দিরের সিদ্ধি বিনায়কের (স্থানীয় ভাষাতে পিল্লাইয়ার) মূর্তিটিকে সমুদ্রের জলে ফেলে দেয়। দৈববলে সেই একই মূর্তি আবার প্রতিষ্ঠিত হয় ওই মন্দিরে। এমনকী, মন্দিরের দরজা তালাবন্ধ করার পরেও একই গণেশমূর্তিকে দেখা যায় ওই মন্দিরের গর্ভগৃহে। লোহার তৈরি ডাণ্ডা দিয়েও আঘাত করা হয় গণেশের ওই মূর্তিকে। আশ্চর্যের ব্যাপার! ডাণ্ডা ভেঙে যায়। তবুও মূর্তিটি অক্ষত থাকে। ডাণ্ডাটির একটি ভাঙা অংশ গিয়ে আঘাত করে ওই অত্যাচারী নাস্তিকের হাঁটুতে। প্রচণ্ড যন্ত্রণাতে মূর্তির সামনে মাথা নীচু করে বসে পড়তে বাধ্য হয় ওই বিধর্মী। এরপর থেকে গণেশের উপাসকে পরিণত হয় ওই নিষ্ঠুর ব্যক্তি।

அருள்மிகு மணக்குள விநாயகர் தேவஸ்தானம்
ARULMIGU MANAKULA VINAYAGAR DEVASTHANAM

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৬৭৪ সালে পুদিচ্চেরীর প্রতিষ্ঠাতা ও তদানীন্তন ফরাসি গভর্নর-ফ্রাঁসোয়া মাঁর্ত্যা ওই মন্দিরে স্থানীয় মানুষদের গণপতি উপাসনা বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে, একটি স্বপ্নাদেশে ফ্রাঁসোয়া জানতে পারেন— ধর্মীয় ভাবনাতে সিদ্ধি বিনায়ক এবং যিশুখ্রিস্ট দু'জনেই সমান সম্মানের অধিকারী। তারপরই তিনি এই বিনায়ক বিগ্রহটিকে একটি বড়ো মন্দির নির্মাণ করিয়ে প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেন। দ্যুপ্লের স্ত্রী এই মন্দিরটিকে গির্জাতে পরিণত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তবে, স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি এই অপকর্ম থেকে বিরত হন। গভর্নর দ্যুপ্লে অবশ্য এই মানাকুল্লা বিনয়গড় মন্দিরের উন্নতিকল্পে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। দ্যুপ্লের ব্যক্তিগত, তামিল দিনলিপিকার ছিলেন আনন্দ রঙ্গ পিল্লাই। পিল্লাইয়ের ডায়েরি বা 'দুবাশ'-এ ফরাসী প্রভাবে পুদিচ্চেরীর সমৃদ্ধির পাশাপাশি মানাকুল্লা মন্দিরের নির্মাণকার্য এবং দৈনন্দিন পূজাবিধির বিশদ বিবরণ আছে। এই মন্দিরে শিবরাত্রি উৎসবের মহাসমারোহে উদ্‌যাপনের কথাও বলেছেন আনন্দ রঙ্গ পিল্লাই।

মানাকুল্লা বিনয়গড় মন্দিরটি নির্মিত হয় সপ্তদশ শতকে। শ্রী অরবিন্দ আশ্রম এবং ফরাসি গভর্নরের রাজভবনের মাঝামাঝি এলাকাতে অবস্থিত এই মন্দিরটি। তামিল মহাকবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী, শ্রীমা ও অরবিন্দ, তাঁদের রচনাতে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এই মন্দিরটির। শ্রীমা মূর্তি উপাসিকা ছিলেন না। তবুও তাঁর পড়ার টেবিলে সবসময়ই পিল্লাইয়ার বা সিদ্ধিদাতা গণেশের একটি গ্র্যানাইট পাথরের মূর্তি শোভা পেতো। ভক্ত মদনলাল হিম্মত সিংকাকে একটি চিঠিতে মাদার লেখেন— 'প্রত্যেকেরই অবশ্যকর্তব্য হলো নিজ নিজ মানসিকতা ও ভক্তি অনুযায়ী সিদ্ধিদাতা গণেশের উপাসনা ও আহ্বান করা।' সিদ্ধি বিনায়ককে শ্রীমা ফুলের মতো সুগন্ধিত জ্ঞানবত্তা ও বৌদ্ধিক বিকাশের অনুঘটক বলে মনে করতেন। 'শ্রীঅরবিন্দ'স অ্যাকশন' পত্রিকার সম্পাদক শ্যামসুন্দরের রচনা থেকে জানতে পারা যায়— মদনলাল হিম্মতসিংহকার দান করা অর্থ থেকেই মানাকুল্লা বিনয়গড় মন্দিরের সংলগ্ন জমিটি কেনা হয়। বর্তমানে সেটি ৬৪, র‌্যু দ্য ল' অর্লিয়ঁস বা মানাকুল্লা বিনয়গড় কোলি স্ট্রিট রাস্তার কাছে অবস্থিত। শ্রীমা সবসময়েই বলতেন— তাঁর আশ্রমের সমস্ত সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার নিরসন করেছিলেন সিদ্ধি বিনায়কই। সেজন্যই অরবিন্দ আশ্রমে আগত দেশি-বিদেশি অনুগামীরা মানাকুল্লা বিনয়গড় মন্দিরেও সিদ্ধিদাতা বিনায়ককে অন্তত একবার দর্শন করতে যান। □

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

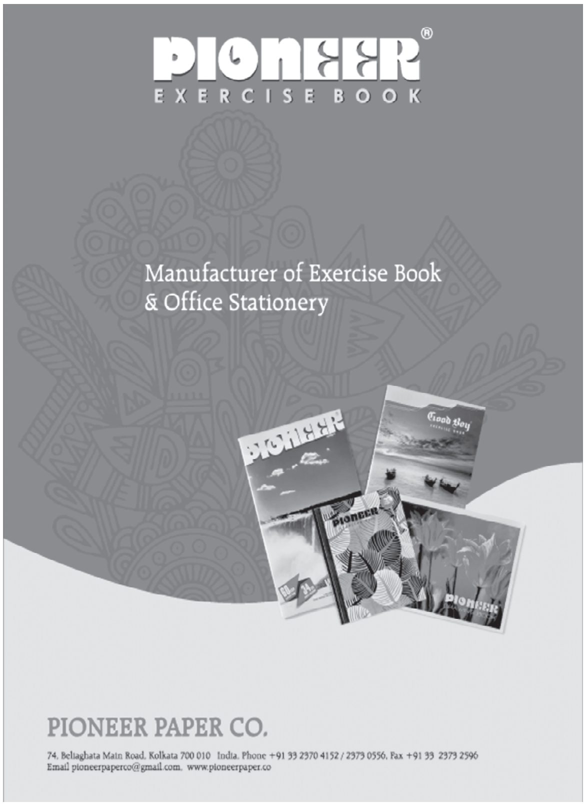

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই
ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

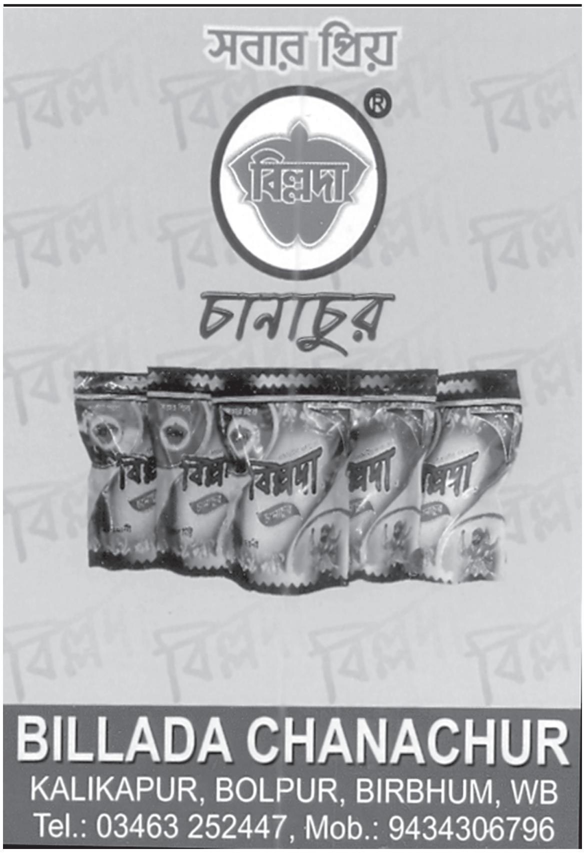

BILLADA CHANACHUR
KALIKAPUR, BOLPUR, BIRBHUM, WB
Tel.: 03463 252447, Mob.: 9434306796

এক দেশ, এক বেতন, এক পাঠ্যক্রমের দাবিতে রাজপথে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ
ABR
শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের অবসান, রাজনীতিমুক্ত শিক্ষাঙ্গণ, সিলেবাসের আরবি
করণ বন্ধ, 'এক দেশ, এক বেতনক্রম' চালু, স্বচ্ছভাবে ধারাবাহিক শিক্ষক নিয়োগ,জাতীয়
শিক্ষানীতি ২০২০-এর দ্রুত রূপায়ণ এবং সুষ্ঠ বদলিনীতি প্রণয়ন সহ ১৫ দফা দাবীতে আগামী
১০ই ফেব্রুয়ারী ২০২১
REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA

জাতীয়তাবাদী ভাবনার আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে, শিক্ষাক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনার উদ্দেশ্যে, রাজনীতিমুক্ত শিক্ষাঙ্গনের দাবিতে গত ১০ ফেব্রুয়ারি কলকাতার রাজপথে নামে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ। এদিন শিক্ষক সংগঠনের পাঁচহাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী একযোগে ১৫ দফা দাবি নিয়ে মহামিছিলের আয়োজন করেন। মিছিল শেষে বিকাশ ভবনে শিক্ষা অধিকর্তার কছে তাঁরা তাঁদের দাবি সনদ পেশ করেন।

এদিন সল্টলেক পূর্বক্ষেত্র সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সামনে থেকে সাতজন বঙ্গ মনীষীর নামে ব্লক ভাগ করে এই মহামিছিল শুরু হয়। বিধান নগর পৌর ভবনের সামনে গিয়ে মিছিলকে প্রশাসন আটকায়। সুশৃঙ্খল মিছিল সেখানেই অবস্থান করে। এবিআরএসএম-এর অন্তর্ভুক্ত শিক্ষক ও অধ্যাপক সংগঠনের ৬জনের প্রতিনিধি দল বিকাশ ভবনে গিয়ে তাদের দাবিপত্র পেশ করে। দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু বদলি নীতি প্রণয়ন, এক দেশ, এক বেতন ও এক পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, প্রাথমিক শিক্ষকদের গ্রেড ও পে সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান, পার্শ্বশিক্ষক, এসএসকে, এমএসকে, কমপিউটার শিক্ষক-সহ সমস্ত শিক্ষকের বেতনবৈষম্য দূরীকরণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত নিয়োগকে সার্ভিস কমিশনের আওতায় আনা, বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে একই নিয়োগবিধি প্রণয়ন, শিক্ষাক্ষেত্রকে দুর্নীতিমুক্ত ও মাদকমুক্তকরণ। রাজ্যের ২৩টি জলা থকেই প্রতিনিধিরা মহামিছিলে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের স্বতঃস্ফুর্ত যোগদান ও আবেগ এই মিছিলকে এক অনন্য তাৎপর্য এনে দেয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি অনিমেষ মণ্ডল ও রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কানুপ্রিয় দাস, বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি আশিস মণ্ডল ও রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপী প্রামাণিক, জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি অধ্যাপক দেবমাল্য দত্ত ও রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক কৃষ্ণ সরকার। সবাই তাঁদের বক্তব্যে শিক্ষাক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য চলছে, তা থেকে শিক্ষাক্ষেত্রকে মুক্ত করে শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে তাঁদের সংগঠন কাজ করে চলেছে বলে জানান।

জলপাইগুড়িতে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের উপনয়ন দিবস উদ্যাপন

মনীষী ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার প্রচেষ্টায় ১০৮ বছর আগে ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ২৭শে মাঘ ঐতিহাসিক পুণ্যতোয়া করতোয়ার উজান পাড়ে ব্রাত্য মোচন করে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের মানুষ উপবীত ধারণ উৎসব শুরু করেন। ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার সেই পুণ্যকর্মকে স্মরণ করে প্রতি বছরের মতো এবারও গত ২৭শে মাঘ আন্তর্জাতিক ক্ষাত্রদিবস উদ্যাপন কমিটির উদ্যোগে উত্তরবঙ্গ রাজবংশী কুলগুরু, কুলশিষ্য সম্মেলন এবং আন্তর্জাতিক রাজবংশী ক্ষত্রিয় মহামিলন দিবস উদ্যাপিত হয় জলপাইগুড়ি জেলার করতোয়া নদীর পাড়ে (চেয়ারীখাঁড়ি) মেহেন্দিগছ, আমবাড়ি, ফলাকাটা। দু'দিন ব্যাপী এই উৎসবে রাজবংশী সমাজের পাঁচহাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। একদিন আগে শক্তিসঞ্চারিণী, মা গঙ্গা, শিবঠাকুর ও রাধাগোবিন্দের পূজা হয়। পরদিন ভোর থেকে উষাকীর্তন, পতাকা উত্তোলন, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করা হয়। তারপর বহু মানুষ মস্তক মুণ্ডন করে, করতোয়া নদীতে স্নান করে উপবীত ধারণ করেন। এই মিলন উৎসবে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার ক্ষাত্র আন্দোলনের বিভিন্ন দিক তথা হিন্দু সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার বিষয়ে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন ড. অমলকান্তি রায়, গবেষক ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব ভীষ্মদেব অধিকারী, হরদেব অধিকারী, করুণাকান্তি অধিকারী প্রমুখ। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসকে বাঙ্গালি চিরকাল মনে রাখবে

কল্যাণ চৌবে

১৯০৭ সাল। অন্ধকার এক রাত। বাংলাদেশে এক হিন্দুর বাড়ি আচমকা ঘিরে ধরেছিল দাঙ্গাবাজরা। প্রায় চারশো মুসলমানের আকাশ ফাটানো চিৎকার। যে কোনও সময়ে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবে তারা। কাঁপছে গোটা পরিবার। ঠিক সেই সময়েই বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। সঙ্গে সামান্য কয়েকজন। সেই সামান্য লোক নিয়েই বুক চিতিয়ে চারশো মুসলমান দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। অসম লড়াইয়ে জিতলেন তিনি। বাড়ি জ্বালিয়ে দিতে আসা দাঙ্গাবাজরা পিছু হটতে বাধ্য হলো সেই মানুষটার অদম্য জেদের কাছে। তিনি আর কেউ নন। স্বনামধন্য পুলিনবিহারী দাস। বঙ্গসমাজ যাঁকে চেনে এক বিপ্লবী জনক হিসেবে। এক অদম্য হিন্দু হিসেবে।

১৮৭৭ সালে, এখনকার শরীয়তপুর জেলায় নড়িয়া উপজেলার লনসিং গ্রামের এক শিক্ষিত দাসপরিবারে জন্ম পুলিনবিহারী দাসের। ১৮৯৪ সালে ফরিদপুর জেলাস্কুল থেকে এন্ট্রাস পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ঢাকা কলেজে ভর্তি হন পুলিনবিহারী। সেইসঙ্গে ওই কলেজের গবেষণাগারের ব্যবহারিক শিক্ষক হিসেবেও কাজ করতে থাকেন। ছোটোবেলা থেকেই পুলিনবিহারীর শরীরচর্চার দিকে প্রবল ঝোঁক ছিল। তিনি একজন দক্ষ লাঠিয়ালও ছিলেন। ১৯০৫ সালে বিখ্যাত লাঠিয়াল মুর্তাজার কাছ থেকে লাঠিখেলা ও তলোয়ার চালানোর কৌশলও রপ্ত করেছিলেন। তার আগে ১৯০৩ সালে কলকাতায় সরলাদেবীর আখড়ার সাফল্য দেখে তিনি ঢাকায় টিকাটুলিতে একটি নিজস্ব আখড়া চালু করেন।

পুলিনবিহারীর জীবনের মোড় ঘুরে যায় বিপিনচন্দ্র পাল ও প্রমথনাথ মিত্রের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ ও অসমে সফর করার সময়। তখন ব্রিটিশরাজের অত্যাচারে কাঁপছে গোটা দেশ। মুক্তির পথ খুঁজছে বাঙ্গলা। সেই সময়ই ভারতমাতার মুক্তির জন্য প্রমথনাথের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে পুলিনবিহারী দাস এগিয়ে আসেন এবং তার উপর ঢাকায় অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠার ভার বর্তায়।

অবশেষে সেই বছরেরই অক্টোবর মাসে ৮০ জন যুবক নিয়ে পূর্ববঙ্গের ঢাকায় তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন অনুশীলন সমিতির। পুলিনবিহারী খুব ভালো সংগঠক ছিলেন। তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতায় বাঙ্গলাদেশ জুড়ে অনুশীলন সমিতির প্রায় পাঁচশো শাখা স্থাপিত হয়। এরপর তিনি সেই ঢাকাতেই প্রতিষ্ঠা করলেন 'ন্যাশানাল স্কুল'। নামে স্কুল হলেও আসলে সেটা ছিল সশস্ত্র বিপ্লবীদল তৈরির একটা প্রশিক্ষণকেন্দ্র। এইখানে প্রথমে ছাত্রদের লাঠিখেলা এবং কাঠের তরোয়ালের মাধ্যমে তাদের সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য তৈরি করা হতো। ব্রিটিশ পুলিশ ১৯০৮ সালে গ্রেপ্তার করে পুলিনবিহারীকে। কিন্তু শত অত্যাচার, শত নিষ্পেষণ তার বিপ্লবীসত্তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর আবার তাঁর বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়। এই সময়েই অনুশীলন সমিতির ঢাকা দল কলকাতা শাখাটিকে পরিচালনা করতে শুরু করে।

১৯১০ সালের জুলাই মাসে ৪৬ জন বিপ্লবীর সঙ্গে পুলিনবিহারী দাসকে ঢাকা ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে পুলিনবাবুকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া ও সেলুলার জেলে স্থানান্তর করা হয়। যেখানে হেমচন্দ্র দাস, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, বিনায়ক সাভারকরের মতো বিখ্যাত বিপ্লবীদের সান্নিধ্যে আসেন তিনি। ১৯১৮ সালে পুলিন দাসের সাজা কিছুটা কমে এবং তাকে বাড়িতে নজরবন্দি করে রাখা হয়। ১৯১৯ সালে তাঁকে পুরোপুরি ভাবে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি পাওয়ার পর সমিতির কাজে আত্মনিয়োগ করার চেষ্টা করেন কিন্তু তখন তার সেই সংগঠনকে ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেয়। এরপর নাগপুর ও পরে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে অনেক বিপ্লবী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

কিন্তু পুলিনবিহারী দাস কখনও গান্ধীজীর আদর্শের সঙ্গে আপোশ করতে চাননি। ১৯২২ সালে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেন। ১৯২৮ সালে কলকাতার মেছুয়াবাজারে বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এটা ছিল শারীরিক প্রশিক্ষণের একটি কেন্দ্র। যেখানে যুবকদের লাঠি চালনা, তলোয়ার চালনা ও কুস্তি শেখানো হতো।

তিনি বিবাহিত এবং সন্তানের জনক হলেও পরবর্তীকালে এক যোগীর সংস্পর্শে এসে তাঁর মানসিকতায় বদল ঘটে। পুলিনবিহারীর মধ্যে ত্যাগের বাসনা জাগ্রত হয়। এরপর ১৯৪৯ সালের ১৭ আগস্ট ৭২ বছর বয়সে তাঁর এই সুদীর্ঘ কর্মবহুল জীবন শেষ হয়। বাঙ্গলামায়ের এক অদম্য সাহসী নির্ভীক সন্তান ছিলেন পুলিনবিহারী দাস। সময় তাঁকে ভুলে গেলেও বাঙ্গালির ইতিহাস চিরকাল মনে রাখবে তাঁকে।

(লেখক জাতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন খেলোয়াড়)

প্যারাটিচারদের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ কেন?

বরুণ মণ্ডল

প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত প্রায় দু' মাস হতে চলল দ্বিতীয় দফায় পশ্চিমবঙ্গের ৪৮ হাজার প্যারাটিচার সম্মান ও বেতন কাঠামোর দাবিতে সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছে। এই মুহূর্তে চলছে আমরণ অনশন। মুখ্যমন্ত্রীর ঐতিহাসিক ২৬ দিনের অনশনকে তাঁরা হারিয়ে দিয়েছেন গত বছরে। কিন্তু তাদের শূন্য হাতেই ফিরতে হয়েছে। এ বিষয়ে কয়েকটি কথা না বললেই নয়।

মুখ্যমন্ত্রী অর্থনৈতিক বাজেট পেশ করলেন সাম্প্রতিক। বাজেট ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন তাঁর সরকার ৩ শতাংশ ভাতা বৃদ্ধি করে রাজ্যের পার্শ্ব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্ষোভ প্রশমন করেছেন। এবং সেই খবর ফলাও করে প্রচারও করলো বেশ কয়েকটা তাঁবেদার মিডিয়া। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের এ এক প্রকার বিচ্যুতি। আসল তথ্য যাচাই না করে মিডিয়ার উপর বিশ্বাস রাখা পাঠকবর্গকে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হলো। যাতে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার ধারক-বাহক তথা শিক্ষাগুরুদের প্রতি সাধারণ জনগণের মনে তৈরি হয় অশ্রদ্ধা। আড়ালে আবডালে বোঝানোর চেষ্টা হলো, এই সমস্ত অযোগ্য প্যারা টিচারদের যতই দাও না কেন পেট ভরবে না।

শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া দেশের সমস্ত রাজ্যের প্যারা টিচারদের চাকরি স্থায়ী করা হয়েছে। কারণ চলতি শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচুর শিক্ষকের প্রয়োজন এবং পার্শ্ব শিক্ষক-শিক্ষিকারা যথেষ্ট যোগ্য ও অভিজ্ঞ। অতি সাম্প্রতিক ছোট্ট রাজ্য অসম তাদের প্যারা টিচারদের বেতন কাঠামো-সহ স্থায়ীকরণ করে নিয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্যারা টিচাররা আজও অভাবের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় টিকে থেকে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধরে রেখেছে।

বাম আমলে কারচুপির দ্বারা নিয়োগ হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের ৪৮ হাজার প্যারাটিচার— তাই নাকি স্থায়ীকরণ করা উচিত নয়। শুধু শিক্ষা দপ্তরের কেন, রাজ্য সরকারের প্রতিটি দপ্তরে নিয়োগ হয়তো হয়েছে, যেটা যে-কোনো সরকারের শাসনকালে হয়ে থাকে। বর্তমান তৃণমূল শাসিত রাজ্যে কিন্তু এমন প্রচুর নিয়োগ হচ্ছে যা দলীয় পদে থাকা নেতৃবৃন্দ হামেশাই স্বীকার করছেন। তার মানে কি ধরে নেওয়া যায় রাজনৈতিক পালাবদল হলে এই সমস্ত দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়োগ অবৈধ বলে বিবেচিত হবে?

পার্শ্ব শিক্ষকরা
আজ রাস্তায়
কেন জবাব দিন

স্থায়ীকরণ না করার পক্ষে আরও যে যুক্তি দেওয়া হয় তা হলো পার্শ্বশিক্ষকরা অযোগ্য। তাহলে প্রশ্ন করা যেতে পারে, অযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে বিরাট শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে কীভাবে? যোগ্যতার প্রশ্নে যে সমস্ত শংসাপত্র থাকার দরকার তা আছে কিনা একবার দেখে নিলেই তো সমস্যা মিটে যায়। সেই পথে রাজ্য সরকার কেন হাঁটছে না?

স্কুল সার্ভিস কমিশন থাকা সত্ত্বেও অবৈধভাবে নাকি পার্শ্বশিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু তথ্য বলছে, নোটিশ জারি, আবেদনপত্র সংগ্রহ, ইন্টারভিউ, মেরিট বাছাই ইত্যাদি সমস্ত প্রকার নিয়ম কানুনের মধ্য দিয়ে প্যারাটিচার নিয়োগ করা হয়েছে। তবে তাঁদের এই দুর্ভোগ কেন?

শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি বারবার বলেন যে, তাদের জন্য শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ করা হয়েছে। কর্মরত শিক্ষকদের জন্য আবার পুনর্নিয়োগ প্রয়োজন কেন? এসএসসি বা টেট পাশ করে নিয়োজিত না হয়ে এমন অনেক স্থায়ী শিক্ষক রয়েছেন, (যারা আবার একদা দলীয়কর্মী হিসেবেই শিক্ষক হয়েছেন বলে শোনা যায়!) তাদের তবে পুনরায় নিয়োগ করা হবে না কেন? ১০ শতাংশ সংরক্ষণ দেওয়া হলেও ২০১১ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত নিয়োগ হলো কই? তবে ১০ শতাংশ সংরক্ষণের লাভ প্যারাটিচাররা পেল কি?

আজ যারা পার্শ্ব শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসেবে স্কুলের সমস্ত রকম দায়িত্ব পালন করছেন, শুধু দায়িত্ব বললে কম হবে, স্থানীয় টিচার হিসেবে তাদের দায়িত্ব বহির্ভূত অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়। এমনকী যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন কারণে বিদ্যালয়মুখী হতে চায় না বা বিদ্যালয়ের পড়াকালীন স্কুলছুট হয়ে পড়েছে, তাদের খুঁজে বার করে আবার স্কুলমুখী করার মতো গুরুদায়িত্ব প্যারাটিচাররা পালন করেন। তাঁদের ভোটের ডিউটিতে সমান দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হয়। অযোগ্য ব্যক্তিদের এতো দায়িত্ব তবে কেন দেওয়া হয়? তারা এই রাজ্যের জনগণ ও ভোটার। মমতা ব্যানার্জি তাদেরও মুখ্যমন্ত্রী। তবে এমন বিমাতৃসুলভ আচরণ কেন? ▯

করোনার আতঙ্ক কাটিয়ে হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা

নিলয় সামন্ত

শুধু ক্রিকেট-ফুটবল নয় অতিমারীর আতঙ্ক কাটিয়ে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরলো হ্যান্ডবলের মতো তুলনামূলক কম জনপ্রিয় খেলাও। ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি মধ্য কলকাতার ওয়েলিংটনের পার্কে আয়োজিত হয়ে গেল পুরুষ ও মহিলাদের রাজ্যস্তরের হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা। টুর্নামেন্টে জয়জয়কার কলকাতা ও হাওড়া জেলার।

পুরুষদের খেলায় ফাইনালে হাওড়াকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন কলকাতা জেলা। ৩০ মিনিটের খেলায় ফলাফল কলকাতার পক্ষে ছিল ৫-২। আবার মহিলা বিভাগে কলকাতাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে হাওড়া। তাদের পক্ষে খেলার ফল ৪-২। এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করেছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হ্যান্ডবল সমিতি যা ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। করোনার প্রাদুর্ভাবের পর এটাই্ হ্যান্ডবলের প্রথম কোনও রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতা বলে জানানো হয়েছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো। সভায় উপস্থিত ছিলেন ঝাড়খণ্ড হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট প্রদীপ কুমার বালামুচা, সঙ্গে ছিলেন পুলক দেব। পুলক দেবের উপস্থিতি সভায় উৎসাহের পরিবেশ নির্মাণ করে। পশ্চিমবঙ্গের খেলোয়াড়রা সবার নজরে আসেন এবং তার থেকে উজ্জীবিত হয়ে নতুন প্লেয়াররা উঠে আসবেন এমনটাই আশা নতুন প্রেসিডেন্ট কুন্তল ঘোষের। তাঁর কথায়, ‘পরবর্তী সময়ে হ্যান্ডবলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।’ ফুটবল, ক্রিকেটের মতো হ্যান্ডবলও পুনরায় বিপুল জনপ্রিয় হবে, এমনই আশা প্রকাশ করেন নয়া প্রেসিডেন্ট কুন্তল ঘোষ।

গোটা পশ্চিমবঙ্গ থেকে নতুন খেলোয়াড়দের নিয়ে আসা হবে। তার দায়িত্ব নিজেই নেবেন বলে জানালেন কুন্তল ঘোষ। আগামী দিনে এই লম্বা চলার পথে সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন তিনি। এই মুহূর্তে কুন্তল ঘোষ পশ্চিমবঙ্গ ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে খেলোয়াড়রা ভারতীয় দলে নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। বেঙ্গল হ্যান্ডবলের ঝাঁ চকচকে বার্ষিক সভা এক নতুন আলো দেখাচ্ছে ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনকে। কুন্তল ঘোষ ও পুলক দেবের উপস্থিতি ও বক্তব্যে রীতিমতো আশার আলো দেখছেন ভারতীয় দলে নির্বাচিত খেলোয়াড়রা।

নির্বাচিত খেলোয়াড়দের মতে, কুন্তল ঘোষের মতো ক্রীড়াপ্রেমী মানুষই এই অ্যাসোসিয়েশনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। সঙ্গে তাঁরা যোগ করলেন, ‘আমরা নিশ্চিত যে এবার আমাদের যে কোনও অসুবিধার কথা কুন্তলবাবুকে নির্দ্বিধায় বলতে পারব।’

এর কয়েক মাস আগে রাজ্যস্তরের অনূর্ধ্ব ১৯ হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা হয় আউশগ্রামের অভিরামপুর এনএস পলিটেকনিক কলেজের মাঠে। রাজ্যের ১৫টি জেলার খেলোয়াড়রা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। অভিরামপুর এনএস স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ও বর্ধমান জেলা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। ফাইনাল খেলায় মুখোমুখি হয় সেন্ট্রাল কলকাতা ও পুরুলিয়া দল। টানটান উত্তেজনার খেলায় ফাইনালে ২৭-১৩ গোলে জয়ী হয় সেন্ট্রাল কলকাতা। সেদিনের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বর্ধমান জেলা পরিষদের শিক্ষা ও ক্রীড়া কর্মাধ্যক্ষ নারায়ণ হাজরা চৌধুরী, বর্ধমান জেলা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্পাদক সোমনাথ রায়, জেলা স্কুল গেমস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য এবং এনএস স্পোর্টস অ্যাকাডেমির কর্মকর্তা মলয় পীটরা। জাতীয় স্তরের হ্যান্ডবল খেলোয়াড় কুশল মণ্ডল-সহ রাজ্য স্তরের জনা পঞ্চাশ খেলোয়াড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। গ্রুপ পর্যায়ে প্রত্যেক খেলা ২০ মিনিট করে অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধমান জেলা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্পাদক সোমনাথ রায় বলেন, ‘খেলাধুলার আরও উন্নতির জন্য আউশগ্রামের এই জায়গাটাকে বেছে নিয়েছি। আগামীদিনে জঙ্গলমহলের এই এলাকার ছেলেরা হ্যান্ডবল খেলায় অংশগ্রহণ করুক।’ টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয় সেন্ট্রাল কলকাতার তরুণ মাহাতো। □

কমল মিত্র

একজন রাগী বাবা অন্যজন স্নেহপ্রবণ

জহর গাঙ্গুলী

রূপশ্রী দত্ত

বাংলা চলচ্চিত্রে পরিণত বয়স্ক পিতৃচরিত্রের অভিনেতা হিসেবে জহর গাঙ্গুলি ও কমল মিত্র উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে জহর গাঙ্গুলীর ভাবমূর্তি ছিল মিষ্টভাষী ও স্নেহপ্রবণ স্বভাবের। কমল মিত্রের পরিচিতি ছিল রাগী ও কঠিন স্বভাবের পিতা হিসেবে। পরিবারে সকলেই তাঁকে ভয় ও সমীহ করত চলচ্চিত্রে।

জহর গাঙ্গুলী (১৯০৪-১৯৬৯) 'বন্দি' চলচ্চিত্রের জন্য 'বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন' পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৪৩ সালে। তিনি পরাধীন ভারতে, অবিভক্ত ২৪ পরগনায় জন্মেছিলেন। তিনি গত শতকের চার ও পাঁচের দশকে বহুসংখ্যক বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'পরশপাথর' ও 'চিড়িয়াখানা'য় তিনি অভিনয় করেছিলেন। জহর গাঙ্গুলী, তুলসী দাস, 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল', মন্ত্রশক্তি (১৯৫৪), 'যখের ধন' (১৯৩৯), 'বন্দি', 'শহর থেকে দূরে' (১৯৪৩) ইত্যাদি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

কমল মিত্র ও গত শতকের পাঁচ ও ছয়ের দশকের অভিনেতা। তিনি পৌরাণিক ও সামাজিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন। পৌরাণিক ছবির মধ্যে 'মহিষাসুর বধ', 'কংস ও দক্ষযজ্ঞ' উল্লেখযোগ্য। সামাজিক ছবির অভিনয়ে রাশভারী পিতা বা পিতৃস্থানীয়ের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় অনবদ্য।

তিনি জন্মেছিলেন, ১৯১২ সালের ৯ ডিসেম্বর। কর্মজীবনের প্রথমদিকে সামরিক বিভাগে চাকরি করতেন। জীবনযাত্রার মধ্যেও ছিল শৃঙ্খলাবদ্ধ ধরন। তিনি দুর্লভ পুস্তকের সংগ্রাহক ও পাঠক ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ও দৈহিক উচ্চতাও দর্শকচক্ষে তাঁকে অভিনয় ভূমিকায় তাঁকে সফল করেছিল। 'নীলাঙ্গুরীয়', 'কংস', 'মহিষাসুর বধ', 'জিঘাংসা', 'অগ্নিপরীক্ষা' 'বন্ধু' ইত্যাদি। তাঁর সম্পর্কে দর্শকদের একটি উক্তি স্মরণীয়— 'Angry Dad of Bengali Cinema'।

বর্ষীয়ান অভিনেতা পাহাড়ী সান্যাল জন্মেছিলেন ১৯৮৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৯৭৪ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি। তিনি একাধারে অভিনেতা ও গায়ক ছিলেন। 'হারানো সুর', 'ভানু গোয়েন্দা, জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট', 'শিল্পী', 'অরণ্যের দিনরাত্রি', 'নায়িকা সংবাদ' ইত্যাদি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। তাঁর আসল নাম ছিল নগেন্দ্রনাথ সান্যাল। ▫

আল্লাদি লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়ার

১৯৪৭ সালে আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। তখন সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা নিয়ে নানারকমের ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। বিদ্যালয় শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা সবদিকেই দেশের নেতা ও শিক্ষাবিদদের নজর পড়ে। নানারকমের কমিশন তৈরি হয়। ডক্টর আল্লাদি লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়ারের নেতৃত্বে একবার একটি কমিশন তৈরি হয়েছিল। আমরা যাকে মুদালিয়ার কমিশন বলি।

১৮৮৭ সালের ১৪ অক্টোবর তাঁর জন্ম। মাদ্রাজেই তিনি পড়াশোনা করেন। মেধাবী ছাত্র ছিলেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর্টস অ্যান্ড মেডিসিনে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯২২ সালে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে এমডি ডিগ্রি লাভ করেন। আমাদের দেশের একজন বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিসিএল ডিগ্রি দিয়েছে। এছাড়া এফআরসিওজি (১৯৩০) এবং এফএসিএস (১৯৪০) উপাধি অর্জন করেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক বিশিষ্ট চিকিৎসক সারাজীবন শুধু তাঁর পেশার অঙ্গনে জীবন অতিবাহিত করেননি। জগতের আরও বড়ো পরিসরে নিজেদের মেলে ধরেছেন। ডক্টর মুদালিয়ারের জীবনেও তাই ঘটেছে। ১৯৩৪ সালে তিনি মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজের স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপক পদে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৩৯ সালে ওই কলেজের অধ্যক্ষপদ লাভ করেন। ধীরে ধীরে প্রশাসন জগৎ তাঁকে টেনে নেয়। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদও তিনি অলংকৃত করছিলেন।

শিক্ষা, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিষয়ক প্রচুর কমিটিতে তিনি সভাপতি, নয়তো সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। সেই তালিকা শেষ হওয়া কথা নয়। শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রী সরকারের যে উপদেষ্টা মণ্ডলী ছিল তার তিনি সদস্য ছিলেন। বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের পরিচালন মণ্ডলীর সভ্য ছিলেন। ব্যাঙ্গালোরের বিখ্যাত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের পরিচালন মণ্ডলীতে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অব টেকনিক্যাল এডুকেসনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য ও দক্ষিণাঞ্চল কমিটির সভাপতি ছিলেন। মাদ্রাজ ইনসস্টিটিউট অব টকনোলজির পরিচালন মণ্ডলীর তিনি সভাপতি ছিলেন।

১৯৪৬ সালে তিনি সারা ভারত শিক্ষা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন তৈরি হওয়ার দিন থেকেই তিনি তার সদস্য। ১৯৫৩ সালে যখন মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন তৈরি হয় তিনি তার সভাপতি হয়েছিলেন। ইউনেস্কোর জন্য যে ভারতীয় কমিটি গড়া হয় তাতও তিনি সভ্য ছিলেন। আন্তর্জাতিক একাধিক সংগঠনে তিনি বিশিষ্ট চিকিৎসক ও শিক্ষাবিদ হিসেবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ নয় বছর ভারত সরকার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় যে প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিল তার নেতৃত্ব দিয়েছেন ডক্টর মুদালিয়ার। ইউনেস্কোতে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ১৯৫১ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত প্রতিবছর গিয়েছেন। ১৯৪৯-৫০ সালে এক বিরল সম্মানের অধিকারী— বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কার্যকরী পরিষদের সভাপতি হয়েছিলেন তিনি। একই ধরনের সম্মান তিনি দ্বিতীয়বার লাভ করেন। ১৯৫৪-৫৬ ইউনেস্কোর কার্যকরী পরিষদের সভাপতির পদ অর্জন করেন। 'অ্যাসোসিয়েশন অব কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটিজ'-এর কার্যকরী সমিতিতে তিনি দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি (১৯৪৮-৫৮) সভ্য ছিলেন। ১৯৬৩ সালে চতুর্দশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনের সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন তিনি। তাঁর পরিশ্রমের কোনো শেষ ছিল না।

দেশ-বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সাম্মানিক উপাধি লাভ করেছেন। আমাদের দেশে কলকাতা, পাটনা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মাদ্রাজ, লক্ষ্মৌ ও উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডিএসসি ডিগ্রি দান করে। ১০৫৪ সালের স্বাধীনতা দিবসে তিনি রাষ্ট্রপতির কাছ থকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫৯ সালে দিল্লিতে ৪৬তম বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন। তাঁর বক্তৃতার শিরোনাম ছিল 'ট্রিবিউট টু বেসিক সায়েন্সেস'। যাঁরা ডাক্তার হচ্ছেন বা হবেন তাঁরা অনুগ্রহ করে তাঁর তাঁর সভাপতির ভাষণ পড়ে দেখবেন।

প্রথাগত বিজ্ঞানীরাই যে শুধু বিজ্ঞানচর্চার অধিকারী হবেন, এই ধারণায় সমর্থন ছিল না তাঁর। প্রচুর বিজ্ঞানীর উদাহরণ দিয়েছেন তিনি, যাঁরা গবেষণাগারের বাইরে কাজ করেছেন। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি চিত্রশিল্পী ছিলেন। উইলিয়াম হার্শেলের মতো জ্যোতির্বিদ একসময় গান-বাজনার দলের প্রধান ছিলেন। ল্যাভয়সিয়ের কর-সংগ্রাহক ছিলেন। প্রিস্টলি ছিলেন গির্জার পাদরি। সবচেয়ে বড়োকথা, আইনস্টাইন পেটেন্ট অফিসের কেরানি ছিলেন। ফ্যারাডে বই বাঁধাই করতেন। যাঁরা বলেন, বংশপরিচয়ের উপর প্রতিভা নির্ভর করে তাঁদের তিনি মোক্ষম জবাব দিয়ে বলেছিলেন, 'প্রতিভা বিকাশের জন্য কোনো জাতপাত বা বংশের কোনো প্রয়োজন হয় না।' আজ যখন জাতপাত, বর্ণ ও ধর্মের বিভেদ মাথা তুলতে চাইছে, তখন ডক্টর মুদালিয়ারের আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি আমরা পরম নিশ্চিন্তে আশ্রয় নিতে পারি।

শ্যামল চক্রবর্তী

ভারতের পথে পথে

পাওনটা

হিমাচল ও উত্তরপ্রদেশ সীমান্তে দেরাদুন যাওয়ার পথে যমুনা নদীর তীরে ৩১৮ মিটার উচ্চতায় পাওনটা সাহিব। দশমগুরু গোবিন্দ সিংহের স্মৃতিবিজড়িত পাওনটা শিখতীর্থ। পাওনটার অর্থ পা রাখার জায়গা। গুরুগোবিন্দ সিংহ ১৬ বছর বয়সে শিরমুরের রাজা মৈদিনীপ্রকাশের আমন্ত্রণে আনন্দপুর সাহিব থেকে পাওনটায় আসেন। পাওনটা সাহিব তাঁরই হাতে গড়া। প্রথম যে পুণ্যভূমিতে গুরুগোবিন্দ সিংহ ঘোড়া থেকে নেমে পা রাখেন সেই স্মৃতিতে নামকরণ হয় স্থানটির। এখানে বসে তিনি গুরু গ্রন্থসাহিবেব বড়ো অংশ লেখেন। যমুনার দক্ষিণ পাড়ে যেখানে ৫২ জন কবির সঙ্গে গুরুজী দরবারে বসতেন, সেই স্মৃতিতে আজও হোলা মহল্লায় কবি-দরবার বসে। এখানে একশো একর জমির উপর তিনি দুর্গ নির্মাণ করেন। অস্ত্রের প্রদর্শনী রয়েছে ভাণ্ডানির গুরুদ্বারায়। বৈশাখি ও হোলি এখানকার আকর্ষণীয় উৎসব। রয়েছ যমুনাদেবী মন্দির, রামমন্দির, কৃষ্ণমন্দির।

জানো কি?

কোন পত্রিকা কে সম্পাদনা করতেন

- হিন্দু প্যাট্রিয়ট-- হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
- ইন্ডিয়ান মিরর—কেশবচন্দ্র সেন।
- যুগান্তর—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।
- সঞ্জীবনী— কৃষ্ণকুমার মিত্র।
- সন্ধ্যা— ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।
- কেশরী ও মারাঠা বা মারহাট্টা— বালগঙ্গাধর তিলক।
- তত্ত্ববোধিনী— অক্ষয়কুমার দত্ত।
- বন্দে মাতরম্— শ্রীঅরবিন্দ।
- বেঙ্গলী— সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভালো কথা

ফুল

লকডাউনের মধ্যে স্কুল না থাকায় বেশি কাজের চাপ ছিল না। তখন দশটি টবে চন্দ্রমল্লিকার চারা বসিয়েছিলাম। ওই ক'মাস চারাগুলির খুব যত্ন করেছিলাম। এবার শীতে আমাদের বারন্দায় আলো করে ফুল ফুটেছে। এখন পাড়ার সবাই দেখতে আসছে। আমারও খুব আনন্দ হচ্ছে। বেশি আনন্দ পেয়েছিলাম যেদিন মা একজনকে বলছিলেন, ফুলের জন্য তিন্নির মোবাইলের নেশা চলে গিয়েছে। আমিও ঠিক করেছি প্রয়োজন ছাড়া আর মোবাইল ছোঁব না। মোবাইলের চেয়ে ফুল অনেক ভালো।

স্নেহা ঘোষ, নবম শ্রেণী, স্টেশন রোড, পাকুড়, ঝাড়খণ্ড।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

আসল কথা

শ্বেতা ঘোষ, ষষ্ঠশ্রেণী, ফরাক্কা ব্যারেজ কলোনি, মুর্শিদাবাদ।

সারাদিন পড়া পড়া
মোটেই ভালো লাগে না
সারাদিন শুধুই খেলা
তাও ভালো লাগে না।
মোবাইলে ভিডিয়ো গেম
বেশি ভালো লাগে না
সবসময় মায়ের বকুনি
তাও ভালো লাগে না।

ভালো লাগে মায়ের কোল
বাবার আদর আরও ভালো
পড়ত বসলে কাকু বলে
ঘরটি যেন হয়েছে আলো।
দিদান বলে আসল কথা
'মানুষ হওয়া চাই'
দাদাই বলে মুচকি হেসে
'তুমি খুবই ভালো দিদিভাই'।

কবিতা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা ।। শ্রীগুরুজী ।। ৪ ।।

মধুকে কাঁধে করেই নিয়ে আসা হলো।

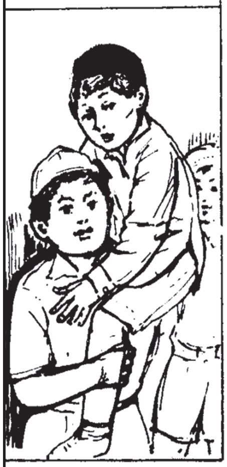

পরিদর্শকের প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিল মাধবরাও।

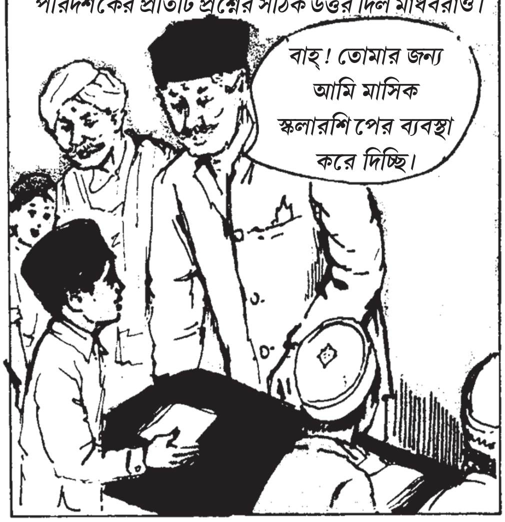
বাহ্! তোমার জন্য আমি মাসিক স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

মাধবের অভিভাষণ ব্যারিস্টার মুলনার এতই ভালো লেগেছিল যে যখনই আসতেন, মাধবকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করতেন।

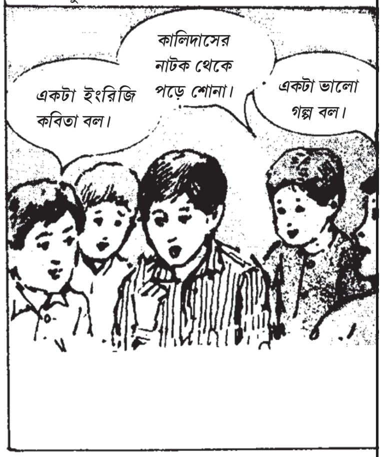
একটা ইংরিজি কবিতা বল।
কালিদাসের নাটক থেকে পড়ে শোনা।
একটা ভালো গল্প বল।

মাত্র এগারো বছর বয়সে মাধবরাও স্কুলের পক্ষ থেকে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

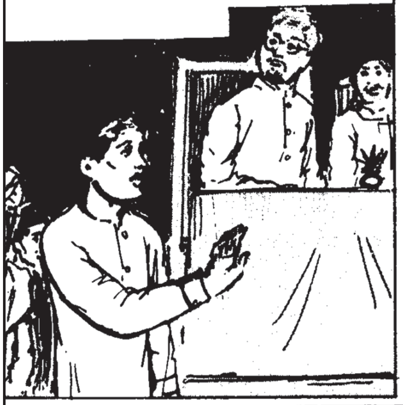

ব্যারিস্টার মুলনা ছিলেন প্রধান অতিথি।

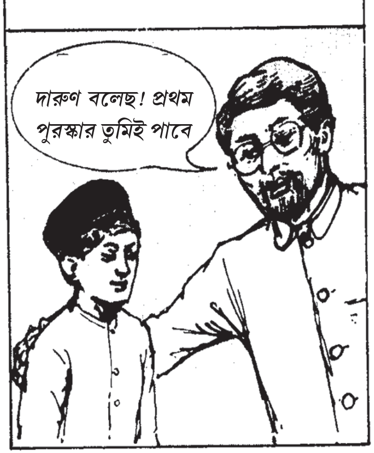
দারুণ বলেছ! প্রথম পুরস্কার তুমিই পাবে

বই পড়তে মাধব খুব পছন্দ করত। অবসর পেলেই বসে পড়ত বই নিয়ে।

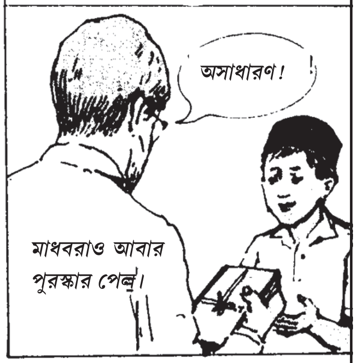

মাধবরাও আবার পুরস্কার পেল।

মাধবরাও বন্ধুদের সঙ্গে নিয়মিত খেলাধুলো করত।

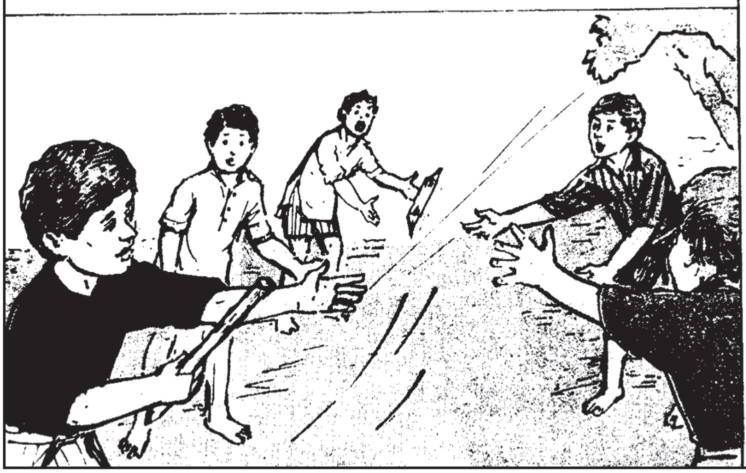

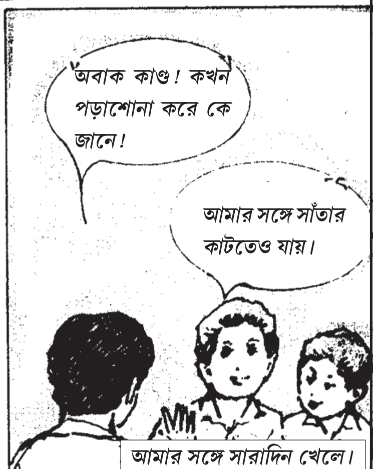
অবাক কাণ্ড! কখন পড়াশোনা করে কে জানে!
আমার সঙ্গে সাঁতার কাটতেও যায়।
আমার সঙ্গে সারাদিন খেলে।

ক্রমশ

‘চলো পাল্টাই’ এই চ্যালেঞ্জ নিয়েই বিজেপি সোনার বাঙ্গলা গড়বে

‘পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী সমস্ত ধর্ম-বর্ণের মানুষকে এই মহৎ কাজে যোগ দেওয়ার জন্য পরিবর্তনের পরিবর্তন করার আহ্বান জানাচ্ছি। আসুন আমরা সবাই মিলে পশ্চিমবঙ্গের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করার চ্যালেঞ্জ নিয়ে সোনার বাঙ্গলা গড়ে তোলার অঙ্গীকার করি।’

দিলীপ ঘোষ

ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলন ছিল অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও ভিন্ন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এক শক্তিশালী উন্নত দেশ গঠন করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত। আর সেই স্বপ্ন পূরণ করতেই স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তাঁদের প্রাণ বলিদান দিয়েছিলেন। যে বাংলা থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের আওয়াজ উঠেছিল তার বর্তমান রূপ পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা দিনের পর দিন করুণ হয়েছে। স্বাধীনতার ৭৩ বছর পর থেকে কংগ্রেস, বাম এবং তৃণমূল আমলে এই বাঙ্গলা ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হয়েছে। বেড়েছে রাজ্যের আর্থিক বোঝা। ঋণভারে জর্জরিত বাংলার প্রতিটি নাগরিক। অর্থনীতি তলানিতে। রাজনৈতিক হিংসায় পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে প্রথম। আইনশৃঙ্খলায় রাজনীতিকরণ চলছে অবাধে। মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর আমলে সুরক্ষিত নয় মহিলারা। গত দশ বছরে রাজ্যে কোনও শিল্প হয়নি। ফলে বেকারত্ব ক্রমশ বেড়েছে। সরকারি দপ্তরে কোনও স্থায়ী নিয়োগ নেই। অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করে চলছে সরকারের বেশিরভাগ দপ্তর। সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার মান খুব খারাপ। দুর্নীতি আর স্বজনপোষণে তৃণমূল সরকার প্রথম স্থানে রয়েছে। এই অবস্থার পরিবর্তন চান বাঙ্গলার মানুষ। বাঙ্গলার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সচেতন মানুষকে সঙ্গে নিয়েই আগামী মে মাসে বিজেপির নেতৃত্বে আসবে সেই পরিবর্তন। পরিবর্তনের পরিবর্তন করে পশ্চিমবঙ্গকে আবার সোনার বাঙ্গলায় পরিণত করার চ্যালেঞ্জ নিচ্ছে বিজেপি। যেমনভাবে বিজেপি-শাসিত উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, বিহার, অসম, ত্রিপুরা-সহ অনান্য রাজ্যে মানুষের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার কাজ করছে, সেভাবেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষের নতুন সরকার কাজ করার অঙ্গীকার নিয়েছে।

কাটমানি ফেরতের দাবিতে মানুষের বিক্ষোভ।

পশ্চিমবঙ্গে শাসকদলের নেতারা বাংলার অরাজকতা প্রসঙ্গে গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, বিহারের তুলনা টানেন। কারণ, এই তিনটি রাজ্যেই বর্তমান বাঙ্গলায় যে অরাজকতা চলছে অতীতে তেমনই অরাজকতা ছিল। বিজেপি শাসন ক্ষমতায় এসে সর্বক্ষেত্রে এই রাজ্যগুলির পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষকে সুশাসন দিয়েছে। তেমনই বাঙ্গলায় বিজেপির সরকার গঠিত হলে সব জায়গায় সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। বাঙ্গলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতায় এনেছিলেন সততার প্রতীক হিসাবে।

কিন্তু নবান্নে ক্ষমতায় বসে তিনি মিথ্যার প্রতীক হয়ে প্রতারণা করেছেন রাজ্যের সাধারণ মানুষের সঙ্গে। কর্পোরেট ক্ষমতায় বিশ্বাসী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লালবাড়ি ছেড়ে নবান্নের ১৪ তলায় গিয়ে ঘাঁটি গেঁড়েছেন। আর সেখান থেকেই তিনি চালিয়ে গিয়েছেন একের পর এক স্বেচ্ছাচারিতা। গত ১০ বছরে যে স্বেচ্ছাচারিতা তিনি করেছেন, তাতে বাঙ্গালি জাতির কোনও উপকার তো হয়নি, বরং তাঁর প্রাণের দলটিকেও খাদের কিনারায় এনে দাঁড় করিয়েছেন। এর জন্য দায়ী তৃণমূল নেত্রীর নিজেকে ভগবান রূপে পুজো করা, অপরিসীম পদলোভ আর আত্মগরিমা। যে কোনও মূল্যে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকাই যদি একটা সরকারের মূল লক্ষ্য হয় এবং তা যদি সাধারণ জনগণের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে হয় তাহলে সেই রাজ্যে আর যাই হোক নাগরিকদের জীবনের কোনও দাম থাকতে পারে না। আর সেই ক্ষমতার অপব্যবহার রোখা বিজেপির প্রথম কাজ। মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে এবং নির্ভয়ে তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারে, সেজন্য অঙ্গীকারবদ্ধ ভারতীয় জনতা পার্টি।

বাঙ্গলায় মানুষকে একটা স্বচ্ছ প্রশাসন দেওয়ার চ্যালেঞ্জ নিয়েছে বিজেপি। যেখানে পুলিশ প্রশাসন তার নিজের মতো আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষার কাজ করবে। পুলিশ পার্টিকর্মী বা দলের হয়ে কোনও কাজ করবে না বা দলদাসে পরিণত হবে না। কোনও রাজনৈতিক দল পুলিশের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। অন্যায় করলে অভিযুক্ত যে দলেরই হোক, পুলিশ তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। সাধারণ মানুষ থানায় গিয়ে পরিষেবা পাবে। সেখানে কারও হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না। পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ যাতে কোনও অভিযোগ করতে না পারে, সেটাই হবে বিজেপি পরিচালিত সরকারের প্রধান লক্ষ্য। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে গণতন্ত্রের বড় পূজারি বলে দাবি করতেন। অথচ গত ১০ বছরে তাঁর শাসনকালে রাজ্যের প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে পঞ্চায়েত, পুরসভা, বিধানসভা ও লোকসভার নির্বাচন কীভাবে হয়েছে তা বাঙ্গলার মানুষ দেখেছেন। নিজে পুলিশমন্ত্রী হয়েও গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেভাবে তিনি রাজ্য পুলিশের একটা অংশকে তৃণমূলের দলীয় কর্মী হিসেবে ব্যবহার করেছেন, ভারতীয় সংসদীয় রাজনীতিতে তা লজ্জার। রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় রেখে, নিজের দলের গুণ্ডা বাহিনীকে দিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৩৪ শতাংশ আসন দখল করেছিলেন। বিরোধীশূন্য করার লক্ষ্যে বাম-কংগ্রেস-সহ বিজেপির জয়ী প্রার্থীদের পুলিশের নানা মামলার ভয় দেখিয়ে সমাজবিরোধীদের দিয়ে দল পরিবর্তন করতে বাধ্য করেছেন। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ক্ষমতায় এলে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন আনবে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর আমলেই নারী-শিশুর কোনও সুরক্ষা নেই। নারী-শিশুদের নির্যাতন ও ধর্ষণের কোনও বিচার হয় না। পার্কস্ট্রিট থেকে কামদুনি, জলপাইগুড়ি থেকে উলুবেড়িয়ার নারী নির্যাতনে দলের ক্যাডারদের নাম জড়িয়েছে। আর অভিযুক্ত যদি দলীয় ক্যাডার হন তাহলেই সাতখুন মাফ। পুলিশ প্রশাসন অপরাধীদের ধরতে ভয় পায়। বিজেপি সরকার বিহার, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, অসমে যেভাবে মহিলা-শিশু সুরক্ষায় কাজ করছে, এই রাজ্যে সেই পন্থা অনুসরণ করা হবে। নারী-শিশু নির্যাতন ও ধর্ষণে অভিযুক্তদের দ্রুত বিচারের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক এমন শাস্তি দেওয়া হবে যাতে নারী নির্যাতনের সাহস কেউ না পায়।

দুর্নীতিতে পশ্চিমবঙ্গ সেরার সেরা শিরোপা পাবে। অন্যান্য রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসে যেভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, সেভাবে বাঙ্গলাতেও দুর্নীতি দমন হবে অন্যতম চ্যালেঞ্জ। তৃণমূলের আমলে দুর্নীতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে জন্মদাত্রী মায়ের থেকেও ছেলে কাটমানি খায়! তাই এই বাঙ্গলার গর্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওপর থেকে নিচুতলার তৃণমূলের বেশিরভাগ নেতারা দুর্নীতিতে ডুবে রয়েছে। কার্শিয়াং থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত শুধুই তোলাবাজি চলছে। সিন্ডিকেটরাজের রমরমা বেড়েছে এই তৃণমূলের জমানায়। সরকারি কাজে, বিশেষ করে পঞ্চায়েত থেকে পুরসভা প্রতিটি স্তরে ব্যাপক দুর্নীতি পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন স্তব্ধ করে দিয়েছে। করোনার সময়ে লকডাউনের মধ্যে গরিব মানুষের রেশনের চাল, ডাল পর্যন্ত লুঠ করেছে। আম্ফানের ক্ষতিপূরণের টাকাও আত্মসাৎ করা হয়েছে। যারা এই তৃণমূল জমানায় দুর্নীতিতে জড়িত বিজেপির হাতে শাসন ক্ষমতা এলে তাদের দুর্নীতির তদন্ত করে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে।

বাঙ্গলার অর্থনীতির অবস্থা খুব করুণ। ২০১১ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার সময় প্রায় ১,৯৩,০০০ কোটি টাকার ঋণ বাঙ্গলার মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে গিয়েছিল। আর তৃণমূল সরকার ২০২১ সালে যখন চলে যাবে তখন বাংলার মানুষের ঋণের বোঝা গিয়ে দাঁড়াবে ৫,৫০,০০০ কোটি টাকা। একজন শিশু পশ্চিমবঙ্গে ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই তার মাথায় ঋণের বোঝা চাপবে ৬৫,০০০ টাকা। বিজেপি এই অর্থনীতির মোকাবিলায় চ্যালেঞ্জের সঙ্গে কাজ করে বাঙ্গলার ঋণের বোঝা কমাবে। প্রয়োজনে বাঙ্গলার জন্য কেন্দ্রের কাছে বিশেষ আর্থিক প্যাকেজের দাবি জানানো হবে। গত দশ বছরে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুধু নেতিবাচক রাজনীতি করেছেন। রাজ্যের উন্নয়নের জন্য যখন কেন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে কাজ করার দরকার ছিল, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের বিরোধিতা করে গেছেন শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য। কেন্দ্রের নানা প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ নিয়ে রাজ্যে একটি করে নতুন নাম দিয়ে রাজ্যের প্রকল্প বলে চালিয়েছেন। দিনের পর দিন নানা প্রকল্পের কেন্দ্রীয় বরাদ্দের টাকার হিসেব সময়মতো পাঠানো হয়নি। ভবিষ্যতের কথা না ভেবে কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই একের পর এক প্রকল্প চালু করেছেন। বাঙ্গলার সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তই করেছেন, তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। নানা প্রকল্প চালু করে দান-খয়রতি করে রাজ্যের ঋণের পরিমাণ বাড়িয়েছেন। কোনও আর্থিক পরিকল্পনা ছাড়াই ক্ষমতা ধরে রাখতে ক্লাবে ক্লাবে টাকা বিলিয়েছেন। আসলে ক্ষমতা যদি অযোগ্য লোকের হাতে চলে যায়, তাহলে তার পরিণাম কী হতে পারে তার সব থেকে বড় উদাহরণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকার।

যুবসমাজকে দিশা দেখাতে গেলে কর্মসংস্থানই অন্যতম পথ হওয়া দরকার। গত ১০ বছর তৃণমূল সরকার পশ্চিমবঙ্গে

YELLOW JOURNALISM বন্ধ
WE WANT JUSTICE

কর্মসংস্থানের কোনও পরিকল্পনা করেনি। আজ পশ্চিমবঙ্গের যুবসমাজ চাকরির জন্য বিজেপি শাসিত ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। কারণ, ওই সমস্ত রাজ্যগুলি শিল্পে সমৃদ্ধ। ঠিক সেই ভাবেই বাঙ্গলায় সঠিক পরিকল্পনা করে যুবসমাজকে এরাজ্য থেকে যাতে বাইরের রাজ্যে চাকরি করতে যেতে না হয় সেই ব্যবস্থা করা হবে। সরকারি দপ্তরগুলোতে শূন্যপদে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষকদের অস্থায়ী চাকরিকে স্থায়ী করা হবে। পুলিশে শূন্যপদ পূরণ করে কর্মসংস্থানের সুরাহা করার চ্যালেঞ্জ নেওয়া হবে। তৃণমূল ১০ বছরে সরকারি শূন্যপদে চুক্তিভিত্তিক চাকরি দিয়েছে। স্থায়ী চাকরির ক্ষেত্রে ঘুষপ্রথা চালু করেছে। পুলিশের চাকরিতে নিয়োগ বন্ধ করে সিভিক পুলিশকে দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি। টেট, প্রাথমিক, উচ্চ-প্রাথমিক, মাদ্রাসা, পার্শ্বশিক্ষক প্রতিটি ক্ষেত্রেই গত দশ বছরে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। কোর্টে একের পর এক মামলা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা রাতের পর রাত জেগে আন্দোলন করেছেন তাঁদের নায্য দাবিতে। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী কেউই এই চাকরিপ্রার্থীদের কথায় গুরুত্ব দেননি। এই সমস্ত বিষয়গুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে সমস্যার সমাধান করা হবে।

কর্মসংস্থানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত শিল্প। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশ, অস্বচ্ছ প্রশাসন গত ৪৪ বছরে শিল্পমহলের কাছে এক নেতিবাচক ধারণা তৈরি করেছে। তাই পশ্চিমবঙ্গে কোনও শিল্প গড়তে চান না শিল্পপতিরা। বিশেষ করে টাটাদের সিঙ্গুর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া পশ্চিমবঙ্গে শিল্প গড়ার স্বপ্নের কফিনে শেষ পেরেকে পুঁতে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ফিরিয়ে দেওয়ার গুজরাটে তৈরি হয়েছিল টাটাদের ন্যানো গাড়ির কারখানা। আজ সেই গুজরাট শিল্পে দেশের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে। সেই গুজরাট মডেল অনুসরণ করে শিল্পপতিদের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে বাঙ্গলায় ফের শিল্পের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা হবে বাঙ্গলায় বিজেপি সরকারের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে শিল্প বিপ্লব ঘটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে তাঁর শাসনকালে একটাও ছোট, মাঝারি বা বড় শিল্প হয়নি। কারণ শিল্প গড়তে গেলে জমি প্রয়োজন। আর জমি অধিগ্রহণে সরকারের ভুল নীতিই এর জন্য দায়ী। এরাজ্যে শিল্পায়নের অবস্থা এমনই যে মুখ্যমন্ত্রীকে এখন ‘চপশিল্প’ প্রচারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে হচ্ছে। কোটি কোটি টাকা খরচ করে বছরের পর বছর ঘটা করে শিল্প-বাণিজ্য সম্মেলন হয়েছে। কিন্তু কোনও শিল্প হয়নি। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সমস্ত শিল্পতালুকগুলো দেখলে বোঝা যাবে ছোট, মাঝারি ক্ষুদ্র শিল্পের কী অবস্থা। জমি অধিগ্রহণ ও শিল্পনীতি তৈরি করে শিল্পের এই কালোছায়াকে দূর করাই হবে বাংলার প্রথম বিজেপি সরকারের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

পশ্চিমবঙ্গের করুণ স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ঠিকভাবে ফিরিয়ে আনাই অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে বিজেপি। গরিব মানুষের চিকিৎসা পরিষেবায় সঠিক পরিকল্পনা এবং রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা হবে। গত দশ বছরে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে কেন্দ্রের অনুদান নিয়ে ঝাঁ-চকচকে বিল্ডিং হয়েছে কিন্তু পরিকাঠামোর কোনও উন্নতি হয়নি। চিকিৎসক নেই, স্বাস্থ্যকর্মী নেই। স্বাস্থ্যের অচলাবস্থা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে করোনা মহামারী। সরকারের অদূরদর্শিতা, অতি তৎপরতা এবং পরিকল্পনাহীন লকডাউন পশ্চিমবঙ্গবাসীকে সঙ্কটে ফেলেছিল। করোনা ও ডেঙ্গু জ্বরের সময় তথ্য লুকোনোর বহু অভিযোগ উঠেছে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি স্থায়ীভাবে শিক্ষক-চিকিৎসক নিয়োগে বড়সড় দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কর্মরত ডাক্তারদের উপর আক্রমণ নতুন কোনও ঘটনা নয় কিন্তু তৃণমূলের আমলে তার মাত্রা বহুগুণ বেড়েছে। এই অবস্থার পরিবর্তন করা হবে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে। সমস্ত চিকিৎসকদের পরামর্শ নিয়ে কীভাবে স্বাস্থ্যের বেহাল দশাকে গরিব মানুষের স্বার্থে ঠিক করা যায়, সেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রধান শর্ত হলো সরকার পরিচালনায় স্বচ্ছতা, জনগণের কাছে জবাবদিহি এবং দুর্নীতি দূরীকরণ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন তৃণমূল সরকার এর কোনওটাই করতে চান না। বাঙ্গলার গণতান্ত্রিক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করতে বিজেপি চ্যালেঞ্জ নিয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ বাঙ্গলার মানুষেরও। আর একমাত্র কেন্দ্রে আর রাজ্যে একই দলের সরকার হলেই বাঙ্গলার এই দুর্দশা ঘুঁচবে। বিজেপিই একমাত্র দল যারা এইরাজ্যে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে স্বচ্ছ প্রশাসন ও উন্নয়ন করতে পারে। তাই পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী সমস্ত ধর্ম-বর্ণের মানুষকে এই মহৎ কাজে যোগ দেওয়ার জন্য পরিবর্তনের পরিবর্তন করার আহ্বান জানাচ্ছি। আসুন, আমরা সবাই মিলে পশ্চিমবঙ্গের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করার চ্যালেঞ্জ নিয়ে সোনার বাঙ্গলা গড়ে তোলার অঙ্গীকার করি।

(লেখক বিজেপির রাজ্য সভাপতি)

স্বামীজীর মানসকন্যা ক্রিস্টিনও ভারতকল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন

স্বপ্না কুণ্ডু

স্বামী বিবেকানন্দের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁকে গুরুপদে বরণ এবং তার সঙ্গে ভারতবর্ষের নারীজাতির উন্নতিকল্পে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন সিস্টার কৃস্টিন গ্রিনস্টাইডেল। সিস্টার ক্রিস্টিন ১৮৬৬ সালের ১৭ আগস্ট জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র তিন বছর বয়সে পিতামাতার সঙ্গে আমেরিকার ডেট্রয়েট শহরে চলে আসেন। তাঁর পিতা ছিলেন সৎ, উদারপন্থী জার্মান পণ্ডিত। অল্প বয়সে পিতার মৃত্যু হওয়ায় পারিবারিক বিপর্যয় নেমে আসে সতেরো বছরের কৃস্টিনের জীবনে। মা ও পাঁচটি ছোটোবোনের ভরণপোষণের দায়িত্ব তাঁর ওপর পড়ে। কৈশোরে সাংসারিক দায়িত্ব পালন ও বাল্যকাল থেকে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে এক স্বতঃস্ফূর্ত আত্মত্যাগের আদর্শ জাগ্রত করেছিল। মাত্র একুশ বছর বয়সে ক্রিস্টিন 'ডেট্রয়েট পাবলিক স্কুল'-এ শিক্ষিকা হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। অবিচলিত হৃদয়ে তপস্যার মতো তিনি সাংসারিক দায়িত্ব পালন করেছেন, দুঃখ ছিল তাঁর চলার পথের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী।

১৮৯৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারির হিমশীতল রাতে ডেট্রয়েট শহরের ইউনিটেরিয়ান চার্চে ক্রিস্টিন তাঁর বন্ধু মিসেস মেরি.সি.কাঙ্কির সঙ্গে প্রথম স্বামীজীর বক্তৃতা শোনেন। এই প্রথম দর্শন সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি। তিনি জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন— 'মাত্র পাঁচ মিনিট বক্তৃতা শোনার পর আমরা বুঝলাম, যে পরশমণির সন্ধান এতকাল করছিলাম তা লাভ করেছি।' স্বামীজীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক শক্তি ক্রিস্টিনকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। এতদিন ধরে অশান্ত চিত্তে যে পথপ্রদর্শকের অনুসন্ধান তিনি করছিলেন, তা পেলেন। বিবেকানন্দের কাছে শুনলেন ভারতের সনাতন বাণী— আত্মার কথা, সেই মহাসত্য মানুষের দেবত্ব তার মজ্জাগত, চিরন্তন, মানুষ নিজেকে অসহায় ভেবে দুঃখ কষ্ট পায়, অথচ জানে না সে অজর, অমর অবিনাশী আনন্দের সন্তান এক দেবশিশু। এর এক বছর পর ১৮৯৫-এর ২৫ জুলাই সহস্রদ্বীপোদ্যানে ক্রিস্টিনকে স্বামীজী দীক্ষা দেন। স্বামীজী মানসচক্ষে দেখেছিলেন ক্রিস্টিনের কর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে জগৎজননীর কাছে উৎসর্গ করেছিলেন, স্বামীজীও সেরূপ তাঁর প্রিয় শিষ্যা ক্রিস্টিনকে জগন্মাতার কাছে উৎসর্গ করেছিলেন।

মেরী লুই বার্ক তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দের দেবমানব' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'যদি মানবিক সম্পর্কের দিক থেকে কেউ তাঁর কন্যা হয়ে থাকেন, তবে আমার ধারণা ক্রিস্টিনই সেই একমাত্র কন্যা।' ১৮৯৬ সালের ৬ জানুয়ারি স্বামীজী ক্রিস্টিনকে 'অকালে ফোঁটা একটি ফুলের প্রতি' শীর্ষক কবিতা লিখে পাঠান—

'হাজার কঠিন মাটিই না হয় হোক না তোমার শয্যা,
আবরণ তব শীতার্ত ঝঞ্ঝার,
জীবনের পথে নাই বা জুটল বন্ধুজনার হর্ষ,
ব্যর্থ তোমার সৌরভ বিস্তার;
...   .
পুণ্যের পরে পাপের অত্যাচার;
তবু প্রশস্ত বিকশিত থাকো; পবিত্র মধুময়
থাকো অবিচল আপনার মহিমায়,
দাও ঢেলে দাও স্নিগ্ধ উদার মধুর সৌরভ তব।
চিরপ্রসন্ন অযাচিত করুণায়।"

স্বামীজীর এই কবিতা তাঁর কাছে ছিল জপমন্ত্রের মতো। আমৃত্যু তিনি ছিলেন এই আদর্শের প্রতিমূর্তি। ১৯০২ সালের ৭ এপ্রিল ক্রিস্টিন কলকাতায় পৌঁছান, পরদিনই বেলুড়মঠে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করেন। স্বামীজী ক্রিস্টিনকে এদেশের

নারীজাতির উপযোগী শিক্ষা ও ভারতবর্ষকে মাতৃভূমিরূপে গ্রহণ করে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজে অগ্রসর হওয়ার শিক্ষা দিয়েছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা বাগবাজারে ১৭ নং বোসপাড়া লেনে যে বিদ্যালয় ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ক্রিস্টিন সেখানে যোগদান করেন। এই বিদ্যালয়কে তিনি মাতার ন্যায় লালনপালন করেছিলেন, তিনি বিদ্যালয়ে প্রথমে মেয়েদের সেলাই, ক্রুশের বোনা, ছবি আঁকা, মাটির জিনিস গড়া আর নানারকম খেলা শেখাতেন। পরে তিনি বাংলা, অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, ইংরেজি পড়াতে শুরু করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ, স্বামী সারদানন্দ মহারাজ ও ভগিনী নিবেদিতা ক্রিস্টিনকে স্কুলের কাজে সহায়তা করতেন। ভারতীয় মেয়েরা যাতে সেলাই শিখে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হয় এই চিন্তাধারায় ক্রিস্টিন নিজে ভারতীয় দর্জির কাছে সেলাই, কাপড়ের মাপজোক, কাটিং ইত্যাদি শেখেন। নিজের এই শেখাকে তিনি বলতেন, 'ট্রেনিং নট এডুকেশন'। ভারতীয় ও পৃথিবীর মানচিত্রের সাহায্যে তিনি শিক্ষার্থীদের মরুভূমি, দ্বীপ, পর্বতমালা চেনাতেন, ভারতের তীর্থস্থানগুলির বর্ণনা দিতেন, কখনও বৌদ্ধযুগ, কখনও হজরত মহম্মদের কাহিনি শোনাতেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল পাঠ্যসূচি যেন আরও জ্ঞানগর্ভ হয় যাতে পড়ুয়াদের মননের বিস্তার ঘটে, বিদ্যালয়টি যেন বাগবাজার পল্লীর নারীজাতির পরম আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। ১৯০৩ সালের ২ নভেম্বর জগদ্ধাত্রী পূজার দিনে মহিলা বিভাগের সূচনা হয় এবং উদ্বোধনের দিনই অভাবনীয় ভাবে ২৫ জন মহিলা শিখতে উপস্থিত হয়েছিলেন, পরবর্তীতে এই সংখ্যাটা বেড়ে হয় ৬০ থেকে ৭০ জন। সিস্টার নিবেদিতা ও ক্রিস্টিন তাঁদের সেবাদর্শের আদর্শ আন্তরিক আত্মীয়সুলভ আচরণের মাধ্যমে তখনকার সমাজের মানুষজনের মন অল্পদিনেই জয় করে নেন।

স্কুলের মেয়েরা নিবেদিতাকে সান্‌দিদি ও ক্রিস্টিনকে মুনদিদি বলতো, তারা ক্রিস্টিনকে গুরু অপেক্ষা বন্ধু বলেই বেশি ভালোবাসতো, তিনিও পড়ার সময় কেউ ভুল করলে বকুনির বদলে সস্নেহ ক্ষমাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেন। এভাবেই ছাত্রীরা আরও বেশি করে পাঠে মনঃসংযোগ করত। ভগিনী নিবেদিতা বিদ্যালয়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন আর সিস্টার ক্রিস্টিন মায়ের মতো লালনপালন করেছিলেন। তিনি একদিন নিবেদিতাকে বলেছিলেন, 'এই গলির বাসিন্দাদের আমি বুঝিয়ে ছাড়বো— 'ওরা যেমন আর্য' আমিও তেমনি।' মেয়েদের শিক্ষার আন্তরিকতায় ১৭ নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়ির পাশের ১৬ নং বাড়িটিও ভাড়া নেওয়া হয় এবং বাড়ির মেয়েদের স্কুলে আনার জন্য গাড়ির ব্যবস্থাও করা হয়।

স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ক্রিস্টিন খুব অল্পদিনেই ভালো বাংলা শিখে নিয়েছিলেন এবং মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন। ভারতীয় নারীর মতোই তিনি শাড়ি পরতেন। শ্রীশ্রী সারদামায়ের প্রতি ক্রিস্টিনের অপরিসীম শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। শ্রীমাও তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন! সিস্টার ক্রিস্টিন ১৯১১ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত একনিষ্ঠ এবং অতিশয়ে দক্ষতার সঙ্গে বিদ্যালয় পরিচালনা করেন। এরপর সুধীরা বসুর ওপর বিদ্যালয়ের ভার দিয়ে ১৯১৪ সালে তিনি আমেরিকায় যান। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের আবহে তিনি দশবছর ভারতে ফিরতে পারেননি। ১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে ক্রিস্টিন ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। বিদ্যালয়ের পাশে ৮নং বোসপাড়া লেনে বাস করতে থাকেন। ইতিমধ্যে স্কুলের নতুন পরিস্থিতি ও শারীরিক অক্ষমতার জন্য ক্রিস্টিন কিছুদিন শিক্ষকতার কাজ থেকে অবসর নেওয়া ঠিক করেন এবং হিমালয়ের কোলে তাঁর প্রিয় আলমোড়ায় বিশ্রাম নিতে যান। এই সময় তাঁর জীবনচর্চা ছিল বিবেকানন্দময়। অবশেষে ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে ক্রিস্টিন ভগ্নস্বাস্থ্যে পুনরুদ্ধারে আমেরিকায় যান। ১৯৩০-এর ২৭ মার্চ তাঁর নশ্বর দেহত্যাগ করার আগে পর্যন্ত তিনি ডেট্রয়েটে ভারতীয় ইতিহাস ও বেদান্তদর্শনের ওপর ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস নিতেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে লিখেছিলেন, 'এই মহাবিশ্বে অসংখ্য গ্রহ-তারা-নক্ষত্রের পরিক্রমায় আজ ধরণীর এই দেবভূমি ভারতে এসেছি। এই অতিমানবিক শক্তিই আমার মানসিক শক্তিকে প্রবল শক্তিময়ী করে তুলেছে। আজ এই শক্তি ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করছি।' প্রব্রাজিকা সত্যব্রতপ্রাণা তাঁর 'ক্রিস্টিয়ানা— এক নীরব নিবেদন' কবিতায় সিস্টার ক্রিস্টিনকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন—

'অয়ি পূজারিণী, মন্ত্র তোমার অতুল সে অনুপম,
তোমার স্বরূপ চিদানন্দরূপ—
'শিবোহহং শিবোহহং'।'

আমরাই সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত শুদ্ধ সত্তঃ পবিত্র ভারতপ্রাণা দেবকন্যাকে।

তথ্যসূত্র :

১. সার্ধশতবর্ষে ভগিনী ক্রিস্টিন প্রসঙ্গ : প্রকাশিকা : রামকৃষ্ণ সারদা মিশন, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস্ স্কুল।
২. স্বামীজীর ক্রিস্টিন : প্রব্রাজিকা ব্রজপ্রাণা। উদ্বোধন।

হ্যাঁ! আমরাই আপনাকে দিতে পারি
এক উন্নতমানের পরিষেবা
কারণ
আমাদের কাছ থেকে আপনি পাবেন

MUTUAL FUNDS Sahi Hai

OUR PRODUCTS
- Portfolio Management Services
- Mutual Fund
- Life Insurance
- General Insurance
- Mediclaim
- Accidental Insurance
- Company Bond & Fixed Deposit

OUR PLANNING
- Retirement Planning
- Pension Fund
- Children Education Fund
- Daughter Marriage Fund
- Estate Creation
- Wealth Creation
- Tax Planning

মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন
(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা
১৯৯৬ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত
SIP তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন
তাদের প্রত্যেকের ফাণ্ড ভ্যালু বর্তমানে ১ কোটি টাকা
২০ বছরে মোট বিনিয়োগ ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মাত্র

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
E-mail : drsinvestment@gmail.com
Find us on Facebook
মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

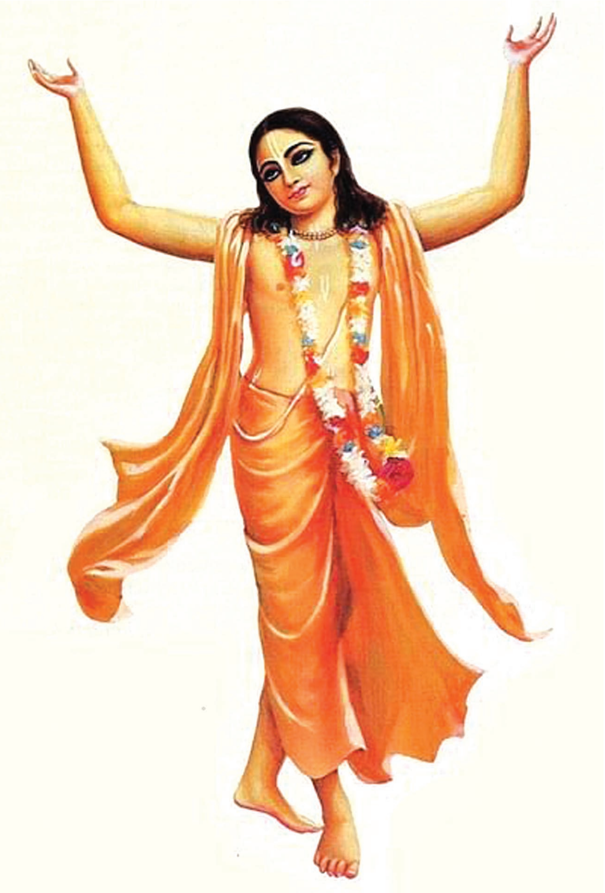

প্রবহমান হিন্দু ধর্মের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক শ্রীচৈতন্যদেব

গৌতম কুমার মণ্ডল

১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি দিনটি ছিল দোল পূর্ণিমা। সে রাত্রে আবার চন্দ্রগ্রহণ ছিল। নবদ্বীপের জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর ঘর আলো করে এলেন নিমাই। পর পর সাতটি কন্যাসন্তানের অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়েছিল বলে পাড়াপড়শীরা তেতো নিমগাছের সঙ্গে মিল রেখে শিশুর নাম রেখেছিলেন নিমাই। নিমাইয়ের জ্যৈষ্ঠ এক অগ্রজ ছিলেন। নাম বিশ্বরূপ। তিনি সন্ন্যাস নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যান। পিতা-মাতার ভয় ছিল পাছে নিমাইও সন্ন্যাস নেয়। তাই প্রথম দিকে জগন্নাথ মিশ্রের মতো পণ্ডিত মানুষও বালকের পড়াশোনার বিষয়ে খুব একটা মন দেননি। কারণ তাঁর ভয় ছিল পড়াশোনায় ভালো হলেই নিমাইয়েরও বুঝি সংসারে বৈরাগ্য আসবে। বিশ্বরূপ নামের সঙ্গে মিল রেখে নিমাইয়ের নাম রাখা হয় বিশ্বম্ভর। কিন্তু জগন্নাথ মিশ্রের মতো শিক্ষিত ও মার্জিত গুণীজনের পক্ষে ছেলেকে বিদ্যাশিক্ষা না দিয়ে মূর্খ করে রাখা সম্ভব হয়নি। তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হলো নবদ্বীপের গঙ্গাদাস পণ্ডিতের পাঠশালায়। তার কিছুদিনের মধ্যেই পিতার মৃত্যু হয়। অত্যন্ত শোকাবহ এই বিচ্ছেদ বুক পেতে গ্রহণ করতে হয়েছিল বালক বিশ্বম্ভরকে।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের নবদ্বীপ পূর্ব ভারতের জ্ঞানচর্চা ও বিদ্যাচর্চার এক অন্যতম কেন্দ্র ছিল। রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত রঘুনন্দনের মতো ভারত বিখ্যাত পণ্ডিতদের নাম-ডাকে সে সময়ের নবদ্বীপ একটি বিরাট বিদ্যাচর্চাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ভারতবর্ষের অনেক পণ্ডিত তর্কযুদ্ধের অভিলাষে নবদ্বীপে আসতেন। নবদ্বীপে বিজয়ী হতে পারলে পাণ্ডিত্যের ভারতজোড়া খ্যাতি হতো। নিমাইয়ের বড়ো হয়ে ওঠা ও বিদ্যাচর্চার সবচেয়ে প্রামাণ্য পরিচয় আছে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত'-এ। নদীর ঘাটে স্নান করতে আসা পাড়াপ্রতিবেশীদের জ্বালাতন করে অতিষ্ঠ করে তোলা নিমাইয়ের যেন নিত্যকর্ম হয়ে উঠেছিল। এরা অনেকেই শচীদেবীর কাছে তাঁর ছেলের নামে অভিযোগ জানাতেন। গঙ্গার ঘাটেই বল্লভ আচার্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে দেখে পঞ্চদশ অসম্মতির পর মা-ও মেনে নেন। আমাদের এই বিষয়টি মনে রাখা দরকার যে নিজের ইচ্ছায় প্রাক্-বিবাহ প্রেম থেকে বিশ্বম্ভর বিবাহ করেছিলেন। অর্থাৎ আজ যাকে বলে প্রেম করে বিয়ে। প্রেমের ক্ষেত্রেও বিশ্বম্ভরের ব্যক্তিচরিত্রের দৃঢ়তা এই বিষয়টি থেকে বোঝা যায়।

বিশ্বম্ভর বড়ো হয়ে উঠলেন। নবদ্বীপের বিশিষ্ট পণ্ডিত হিসেবে পরিচিত হলেন। অধ্যাপক হিসেবে তাঁর খ্যাতি বাড়ল—

'সর্ব্ব নবদ্বীপে সর্ব্ব লোকে হইল ধ্বনি।
নিমাঞি পণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি।' (চৈতন্য ভাগবত, আদিখণ্ড)

তাঁর শিষ্যের দল বাড়ল। আয়ও বাড়ল। সংসারী হিসেবেও দায়িত্ববান হলেন তিনি। আরও কিছু উপার্জনের আশাতেই নিমাই গেলেন পূর্ববঙ্গে। সেখান থেকে ফিরে এসে শুনলেন তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর সর্পদংশনে মৃত্যু হয়েছে। এই একটি ঘটনা নিমাইয়ের জীবন আমূল বদলে দিল। আমরা বলতে পারি গৃহী নিমাইয়ের সন্ন্যাসী চৈতন্যদেব হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ পত্নীর এই অকস্মাৎ মৃত্যু। উদাসী, সংসার বিরাগী হয়ে উঠলেন নিমাই। শচীমাতা বিষণ্ণ। সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাওয়া সন্তান বিশ্বরূপের স্মৃতি তাড়না করল তাঁকে। ছেলেকে ঘরে বাঁধতে আবার বিয়ে দিতে চাইলেন মা। পাত্রীও খুঁজলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া। কিন্তু নিমাইয়ের বিবাহে আর মন নেই। শেষ পর্যন্ত মায়ের কথায় বিবাহ করলেন। কিন্তু আর আগের মতো সংসারী বা গৃহী হয়ে উঠলেন না।

বয়স তখন তেইশ। পিতার মৃত্যু হয়েছে অনেকদিন আগেই। কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে নিমাই গেলেন গয়াধামে। উদ্দেশ্য স্বর্গত পিতৃদেবের উদ্দেশে পিণ্ডদান। একদিকে পিতার স্মৃতি আর অন্যদিকে প্রিয়তমা পত্নীর। শোকে আকুল চিত্ত। গয়ায় গিয়ে দর্শন লাভ ঈশ্বরপুরীর। এই ভক্তিমান মানুষটির ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখে নিমাইয়ের চিত্ত আরও ব্যাকুল হলো। আর গৃহে ফিরতে চাইলেন না তিনি—

'প্রভু বলে তোমরা সকলে যাহ ঘরে।
মুঞি আর না যাইমু সংসার ভিতরে।।'
(চৈতন্য ভাগবত, আদিখণ্ড)

কিন্তু সঙ্গীরা কোনো রকমে তাঁকে ঘরে নিয়ে আসেন। ঘরে এসেও সংসারে মন নেই। কৃষ্ণঅন্ত প্রাণ তখন তাঁর। মা শচীদেবী বউমা বিষ্ণুপ্রিয়াকে এনে নিমাইয়ের কাছে বসান, যাতে সংসারের বন্ধন ছিন্ন না হয়। কিন্তু কিছুই কাজ হয় না। ছেলে শুধুই 'কোথা কৃষ্ণ' বলে ক্রন্দন করেন আর 'শ্লোক পড়েন'—

'কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলে অনুক্ষণ।
দিবানিশি শ্লোক পড়ি করয়ে ক্রন্দন।' (ঐ)

এতদিনের পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এবার ভক্তির বিহ্বলতার মিশ্রণ ঘটল। শুষ্ক জ্ঞান হলো সজীব, প্রাণবান, আবেগময়। ভক্তিময় চিত্তেই গেলেন কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট। মন্ত্র গ্রহণ করলেন গুরুর কাছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম নিলেন। আর অচিরেই গৃহ সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। বয়স তখন ২৪ বছর। যুবক সন্ন্যাসী বাঙ্গলার কিছু স্থান ঘুরে গেলেন পুরীধামে। সেখান থেকে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা চিত্তে, পদব্রজে একেবারে দক্ষিণ ভারতে, পরে পশ্চিমে। পঞ্চদশ-যোড়শ শতকের আর কোনো মরমিয়া সাধক এভাবে পদব্রজে ভারতের বিরাট অংশ পরিক্রমা করেননি। চৈতন্যদেব দেখলেন ভারতের গ্রাম গ্রামান্তরের মানুষের অন্তরের মধ্যে ভক্তিভাব। শক্ত শরীর আর বৈরাগ্যে উদাসীন সন্ন্যাসীর এই ভারত পরিক্রমা তাঁর জীবনকে আরও বেশি ভক্তিময় করে তোলে। ভক্তি ও ঈশ্বরপ্রেম এই দেশের আকাশে মাটিতে, জলে হাওয়ায়। ভারত পরিক্রমায় তিনি শিখলেন এ দেশের অনেক ভাষা। তিনি শিখলেন ওড়িয়া, তেলুগু, তামিল, এমনকী মালয়ালম। গোবিন্দদাসের কড়চায় এ সম্পর্কে প্রামাণ্য নিদর্শন আছে— 'কভু বা তামিল বুলি বলে গোরা রায়'। তিনি ঘুরলেন দক্ষিণ ভারতের পথে পথে, গেলেন রামেশ্বরমে। স্নান করলেন কখনো ভদ্রায়, কখনো তুঙ্গভদ্রায়। খানিকটা পশ্চিমে পুনাতেও গেলেন তিনি। কৌপীনধারী যুবক সন্ন্যাসী, গৌরবর্ণ, সুগঠিত শরীর। কণ্ঠে হরিনাম। হরিভক্তিতে উদাসীন চিত্ত। পথে দুষ্টলোকেরা তাঁকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সন্ন্যাসীর কাছে কী আর আছে! শেষ পর্যন্ত সকলেই হরিভক্ত হয়ে উঠেছেন, মাথা নত করেছেন গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসীর পায়ে। ভক্তির প্রাবল্যে অনেক সময়ই এই সন্ন্যাসীর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত। দেশের অনেক অংশে ভ্রমণ সমাধা করে সন্ন্যাসী আবার ফিরে এলেন পুরীধামে।

চৈতন্যদেবের ৪৮ বছরের জীবন। প্রথম ২৪ বছর তিনি নবদ্বীপবাসী। পরের ২৪ বছর তিনি সন্ন্যাসী। সন্ন্যাস জীবনের সময়ের প্রথম ৬ বছর তিনি ভারত ভ্রমণে কাটিয়েছেন। আর বাকি ১৮ বছর তিনি পুরীধামে থেকেছেন। অনেকের মতো উৎকলরাজ গজপতি প্রতাপ রুদ্রদেব তাঁর বিশেষ আস্থাভাজন ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। ক্রমশ ভক্তিভাবে বিভোর হয়েছেন তিনি। বিভোর চিত্তেই পুরীর রথযাত্রায় নৃত্য করেছেন, কখনো বা নীল সমুদ্রকে কৃষ্ণ বলে আলিঙ্গন করেছেন। আর এভাবেই কোনোক্রমে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে পুরীধামেই তাঁর লীলা সাঙ্গ হয়েছে।

২

চৈতন্যদেবের সমকালে হিন্দুধর্ম একদিকে পাঠান সুলতানদের বিরূপতা, অন্যদিকে নিজেদের অন্তর্নিহিত জাতপাতের শতধা বাধায় দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই দুর্বল হিন্দুসমাজকে প্রেম ভক্তির সঞ্জীবনী মন্ত্রে জাগিয়ে তুলেছিলেন চৈতন্যদেব। তাঁর অস্ত্র ছিল হরিনাম, সমবেত নগরকীর্তন, নৃত্যসহাযোগে নগর পরিক্রমা। এসব কাজে কাজির বাধা এলেও তাঁকে ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। কাজিও যে ভক্তির কাছে মাথা নোয়াতে পারেন তা হিন্দুসমাজ দেখল এবং বল পেল। তারা ভক্তিমান পুরুষ চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে নিজেদের লুপ্ত শক্তি ফিরে পেল। চৈতন্যদেব একদিকে যেমন ভক্তিবিহ্বল, অন্যদিকে প্রচণ্ড বীর্যবান পুরুষ। তাঁর ভক্তি ও প্রেমভাবনা কোনোভাবেই তাঁর দুর্বলতা ছিল না।

হিন্দুসমাজের মূল দুর্বলতা তার জাতিভেদ প্রথার মূলে চৈতন্যদেব কুঠারাঘাত করেছিলেন। তিনি প্রেম বিলিয়েছেন আদ্বিজচণ্ডালে। যবন হরিদাস থেকে উচ্ছৃঙ্খল জগাই মাধাই সকলেই তাঁর পরম ভক্তিভাবনার কাছে বশ হয়েছেন। হরিভক্তি পরায়ণ চণ্ডাল তাঁর কাছে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছেন। জাতিভেদের অসারতা দেখানোর জন্যই তিনি শূদ্র রামরায়কে দিয়ে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়েছেন। সপ্তগ্রামের সম্ভ্রান্ত এক কায়স্থ নিম্নশ্রেণীর উচ্ছিষ্ট খেয়েছেন শুনে তিনি খুশি হয়েছেন। গোবিন্দদাসের কড়চায় চৈতন্যদেব বলেছেন—

'মুচি যদি ভক্তিসহ ডাকে কৃষ্ণধনে।
কোটি নমস্কার করি তাহার চরণে।।'

এভাবে হিন্দুধর্মের প্রধান দুর্বলতাটি চিহ্নিত করে তার মূলে আঘাত করেছেন চৈতন্যদেব। তাঁর আঘাতের মাধ্যমেই হিন্দুসমাজ শক্তি ও সংহতি অর্জন করেছে। নইলে পাঠান সুলতানি আমলে বাঙ্গলার হিন্দুসমাজ হয়তো এক বিরাট সংকটের মুখোমুখি হতো।

এ দেশের যোড়শ-সপ্তদশ শতকের সাহিত্য, শিল্প, সংগীত প্রভৃতি বহুক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কথা সকলেই স্বীকার করেছেন। যোড়শ শতকের বঙ্গদেশে সাহিত্য-শিল্পের যে সমুন্নতি তাকে তো এক কথায় 'চৈতন্য রেনেসাঁ' বলে মনে করা হয়। ভক্তিভাবনাই চৈতন্যদেবের মূল অভিজ্ঞান। এ সম্পর্কে একালের বিশিষ্ট দার্শনিক বিমলকৃষ্ণ মতিলাল বলেছেন— 'সাহিত্য শিল্প ও সংগীত বাদ দিলেও সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের পরোক্ষ প্রভাব ছিল বৈপ্লবিক। ধর্মজগতে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি ভগবানের সঙ্গে মানুষের মধুর ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করা। ঠাকুর এখানে প্রেমের ঠাকুর।' (নীতি, যুক্তি ও ধর্ম; বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, আনন্দ পাবঃ)। চৈতন্যের ধর্মসাধনায় তন্ত্র মন্ত্র শ্লোক উপাচার সবকিছুর উপরে মানুষের অবস্থান। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ এখানে মানুষ হিসেবেই শ্রেষ্ঠ। ঐশ্বর্য তাঁর ধর্মের মূল কথা।

রূপ সনাতনের মতো হোসেন শাহের উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীরাও সমস্ত রাজ ঐশ্বর্য ত্যাগ করে চৈতন্যের মাধুর্যে ভরা ধর্মেই আশ্রয় নিয়েছেন। কারো গায়ে ঐশ্বর্য ও বিলাসের কোনো চিহ্ন থাকলে তিনি চৈতন্যের কর্তৃক নিন্দিত হতেন। খুব দৃঢ়ভাবে নিজেদের জীবনাচার থেকে ন্যূনতম বিলাসকে বিসর্জন দিয়েছিলেন চৈতন্যদব ও তাঁর অনুচরেরা। ভক্তি ও বিনয় ছিল তাঁদের ধর্মভাবনার মূল কথা। তাই বলে কোনোরূপ দুর্বলতা এই ধর্মের অংশ নয়। চৈতন্যদেব থেকে নিত্যানন্দ তা বারবার দেখিয়েছেন। রূপ, সনাতন, তাঁদের এক ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও বৃন্দাবনের আরও কয়েকজন গোস্বামীর দ্বারা চৈতন্যের এই ভক্তিভরা ধর্মের একটি তাত্ত্বিক রূপ ক্রমশ গড়ে ওঠে যাকে আমরা এখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম' বলে জানি। এঁদের মতে 'চৈতন্যদেব রাধা ও কৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ', তিনি স্বয়ং অবতার। এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রাণপুরুষ চৈতন্যদেব প্রবহমান হিন্দুধর্মের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, এর নয়নমণি। ❑

শব্দরূপ-৮ (বিষয় অভিমুখ অতীত, বর্তমান) **অরুণ কুমার ঘোড়ই**

■	১	২		■	৩	৪	■
৫			■	৬			৭
■	৮				■		
১০			■	১১	১২	■	
	■	১৩	১৪	■	১৫	১৬	
১৭	১৮	■	১৯				■
২০		২১		■	২২		
■	২৩		■	১৪			■

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. আমিত্ব জ্ঞান সম্পন্ন সত্তা।
৩. কাব্য রচনাকারী।
৫. রাজা বিজয় সেনের প্রশংসা নির্ভর ‘বিজয়- প্রশস্তি’ রচয়িতা।
৬. দাক্ষিণাত্যের পর্বত শ্রেণী। **৮.** রচনার যোগ্য। **৯.** লজ্জা।
১০. তরঙ্গ। **১১.** সুন্দরী রমণী।
১৩. (প্রত্যয়) সর্বাপেক্ষা অধিক বা অল্প (স্ত্রীলিঙ্গ)।
১৫. মাখন।
১৭. ক্ষেত্র, ভূমি ।
১৯. সতত প্রবাহিত (নদী)।
২০. প্রশংসা সূচক কথা।
২২. আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন।
২৩. দীপ্তি/প্রাচীন কবি বিশেষ।
২৪. হত্যাকারিণী।

উপর-নীচ : ১. প্রত্যহ/সর্বদা।
২. বাণভট্টের রচিত বই।
৩. কী পরিমাণ।
৪. বৃহৎ, প্রশস্ত (স্ত্রী লিঙ্গে)।
৬. (কাব্যে) সাগর।
৭. রাজার বাস নগরী।
১০. উদ্দেশ্য যে বস্তুকে।
১২. মনুষ্য গোষ্ঠী।
১৪. চুনি/মূল্যবান রত্ন।
১৬. দাক্ষিণাত্যের এক প্রাচীন সাম্রাজ্য।
১৮. অসামান্য ক্ষমতা, মেধা। **২১.** বসতি।

(● আগামী সংখ্যায় সঠিক উত্তরদাতাদের নাম প্রকাশ করা হবে।)

প্রেরণার পাথেয়

মানুষ যেইরূপ প্রকৃতির হয় তাহার ব্যবহারও সেইরূপ হয়। দিল্লির মুঘল সাম্রাজ্যের মতো পঞ্চাশটি সাম্রাজ্যকে মাটিতে মিশাইয়া দিয়া ঠিক সেইরূপ পঞ্চাশটি সাম্রাজ্য নিজ বাহুবলে যিনি স্থাপিত করিতে পারিতেন সেই মহারাণা জয়সিংহ মুঘলের দাস হইয়া কেন রহিলেন? আর মুষ্টিমেয় মারাঠাদের সহায়তা লইয়া স্বরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে গিয়া শিবাজী হিন্দু পদপাদশাহী কীরূপে স্থাপন করিলেন? ইহার কারণ প্রথমোক্ত ব্যক্তির মনে আত্মগৌরববোধের অভাব ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির আত্মগৌরববোধ পূর্ণমাত্রায় ছিল। আত্মগৌরবের এই মনোভাব হিন্দু সমাজে আজ প্রায় নষ্ট হইতে বসিয়াছে। তাহাকে পুনরায় উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন।

* * *

আজকাল আমাদের খুব প্রশংসা হইতেছে কিন্তু ইহার জন্য অহংকার করিও না বা মনে করিও না যে আমরা খুব বিরাট কাজ করিয়া ফেলিয়াছি। ব্যক্তিগত দিক দিয়া এইরূপ অহংকার নিতান্তই খারাপ আর সঙ্ঘের দিক দিয়া এইরূপ অহংকার করা একেবারেই অনুচিত। লোকে আমাদের প্রশংসা করে ইহার অর্থ এই যে, তাহারা আমাদের কাজ পছন্দ করে। প্রশংসার বিগলিত না হইয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত কাজে লাগিয়া যাওয়া উচিত।

* * *

প্রশংসা শুনিয়া মনে আনন্দ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা উচিত যে ইহার ফলে আমাদের দায়িত্ব অনেক বাড়িয়া যায়।

* * *

সঙ্ঘ কেবল বুদ্ধিহীন শিল্পের সংখ্যা বাড়াইতে চায় না। সঙ্ঘকে রাষ্ট্রনেতা নির্মাণ করিতে হইবে। তোমাদের প্রত্যেককে যোগ্য নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। তোমাদের নিকট সঙ্ঘ ইহা আশা করে। অতএব এরূপ মনে করা উচিত নয় যে কেবল এক ঘণ্টা শাখাই আসিলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হইয়া যায়। সঙ্ঘের কার্যক্রম ছাড়া অন্যান্য সময় এইভাবে ব্যয় করা উচিত যাহাতে তুমি ভালো ভাবে লেখা পড়া শিখিয়াও সঙ্ঘের কাজ করিতে পার। কিন্তু লেখাপড়া শেখার পরে সঙ্ঘের কাজই যাহাতে জীবনের একমাত্র ধ্যেয় হয় সেইরূপ দৃষ্টিকোণ রাখা উচিত।

* * *

স্বয়ংসেবক যেখানেই থাকুক না কেন তাঁহার সব সময় সঙ্ঘের কাজ বাড়াইবার চেষ্টা করা উচিত। সে যে স্থানে যাইবে সেখানে যদি সঙ্ঘের শাখা থাকে তাহা হইলে তাহার উচিত প্রতিদিন যত্ন সহকারে সেই শাখার উন্নতি করিতে চেষ্টা করা। যদি সেখানে সঙ্ঘের শাখা না থাকে তবে তাহার উচিত সঙ্ঘের কথা সেখানকার লোককে বুঝাইয়া সঙ্ঘের শাখা শুরু করা।

* * *

স্বয়ংসেবকের উচিত সঙ্ঘের ধ্যেয় ভালোভাবে বুঝিয়া লইয়া নিজের ব্যবহারকে সেই ধ্যেয়ের অনুরূপ করা।

(‘ডাক্তারজীর বাণী’ পুস্তিকা থেকে গৃহীত)